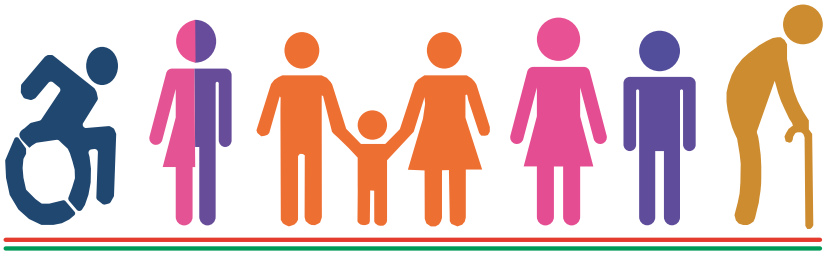

মানবাধিকার দিবস ২০২৩
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা

অনুরণন

১০ ডিসেম্বর ২০২৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

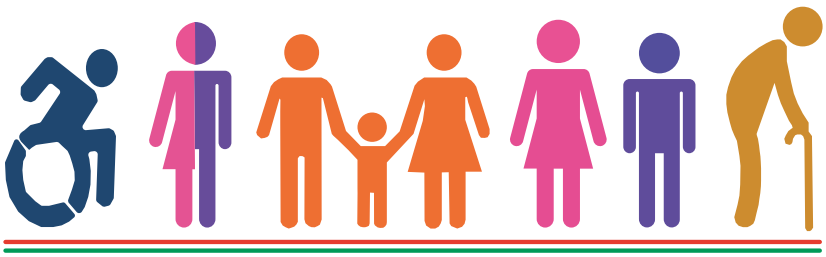

মানবাধিকার দিবস ২০২৩
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা

অনুরণন

১০ ডিসেম্বর ২০২৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি
মো: সেলিম রেজা, সদস্য
মো: আমিনুল ইসলাম, সদস্য
কংজরী চৌধুরী, সদস্য
ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, সদস্য
ড. তানিয়া হক, সদস্য
কাওসার আহমেদ, সদস্য

স্মরণিকা ২০২৩ প্রস্তুতকরণ কমিটি
মো: আশরাফুল আলম, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), (আহবায়ক)
এম. রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক, (সদস্য)
ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক, (সদস্য)
ইউশা রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, (সদস্য)
তাকী বিল্যাহ্, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), (সদস্য)
মোঃ রহমতুল্লাহ, লাইব্রেরিয়ান, (সদস্য সচিব)

সম্পাদনা
মো: আশরাফুল আলম, সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক

প্রকাশনায়
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫

হেল্পলাইন: **১৬১০৮**
e-mail : **info@nhrc.org.bd**
Website : **www.nhrc.org.bd**

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১০ ডিসেম্বর ২০২৩

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Dignity, Freedom, and Justice for All' অর্থাৎ 'সবার জন্য মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদা নিশ্চিতের পাশাপাশি, সকলের নিরাপত্তা বিধান, স্বাধীনতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখাই মানবাধিকার। মানবাধিকার একটি বিশদ ও সামগ্রিক বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একবিংশ শতাব্দীতে ও বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় প্রতিনিয়ত আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে সুনিপুণভাবে মানবাধিকারের বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করেছিলেন। এই সাংবিধানিক অধিকার তথা মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মানবাধিকার বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার রক্ষায় কমিশনের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের সকল নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হতে হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি গণমুখী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উপস্থাপন, প্রতিবেদন দাখিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানবাধিকার বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রেরণ; মানবাধিকার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন জেলার কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন, শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আমি আশা করি, মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১০ ডিসেম্বর ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি। বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য- "সবার জন্য মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার" অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৭৫ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আহ্বান- "Together, let's rejuvenate the Universal Declaration of Human Rights, demonstrate how it can meet the needs of our time and advance its promise of freedom, equality and justice for all"-এর প্রতিও পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে হাজার বছরের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সারা জীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি এমন বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষ মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। এ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি বারবার কারাবরণ করেছেন। অথচ তাঁর সাথেই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। জাতির পিতার নিঃস্বার্থ সংগ্রাম, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতা লাভের মাত্র নয় মাসের মধ্যেই তিনি দেশের সকল নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষার দলিল হিসেবে সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। সংবিধানের ৩য় ভাগে বর্ণিত মৌলিক মানবাধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হলে উচ্চ আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পর এদেশে মানবাধিকার বলে আর কিছু ছিল না। সেই কালরাতে আমাদের পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। খুনিদের যাতে কেউ বিচার করতে না পারে সে জন্য দায়মুক্তি আইন প্রণয়ন করে আমাদের স্বজনদের হত্যার বিচার চাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পূর্বে আমরা এই বর্বরচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে মামলা করতে পারিনি। সরকার গঠনের পর সেই কালো আইন বাতিল করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আমরাই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এরপর থেকে আমরা সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারের ব্যবস্থা করেছি। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি।

২০০৯ সালে সরকারে আসার পর আমরা গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টদেরও বিচারের আওতায় এনেছি। আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ফলে বর্তমানে কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শৈশব/কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক 'মানবাধিকার কোর্স' চালু করেছি। তাছাড়া, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি করা হয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষায় আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। আমরা আমাদের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছি। আমরা নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ নিয়েছি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে আমরা বিশ্ব দরবারে মানবাধিকার রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। আমরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অবদান রেখে যাচ্ছি, যা বিশ্ব পরিমণ্ডলে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। ফিলিস্তিন, সিরিয়াসহ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিপক্ষে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি। বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে মানবাধিকার সংক্রান্ত ৮টি আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশ ২০২৩-২০২৫ মেয়াদে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি)-এর নির্বাচিত সদস্য হিসেবে কাজ করছে।

আমরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

আমি "বিশ্ব মানবাধিকার দিবস" উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি
স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে তাঁর মহান আত্মত্যাগ মানবাধিকার আন্দোলনের পাথেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ ছাড়াও এসিডদগ্ধ নারী-পুরুষ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, পাচারকৃত নারী বা শিশুদের সম্পূর্ণ সরকারি অর্থ ব্যয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের জনগণকে বিনা খরচে সরকারি আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যা সারাদেশের আদালতসমূহে মামলাজট হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভয়ভীতি ও বৈষম্য দূর করে নিরাপদ জীবন নিশ্চিত ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র অন্যতম লক্ষ্য 'ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার' অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করা তথা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়ন ও সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

আনিসুল হক, এমপি
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানবাধিকার শাশ্বত ও সর্বজনীন অধিকার যা জাতি ধর্ম বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহান দিবসে বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা হয়েছে। যা এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য Dignity, Freedom and Justice for All'এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র Universal Declaration of Human Rights (UDHR) গৃহীত হয়। মানবাধিকারের ৩০টি ধারা সমুন্নত রাখা ও নিশ্চিত করা প্রত্যেক জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য। সময়ের পরিক্রমায় মানবাধিকারের বৈশ্বিক আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানবাধিকার রক্ষায় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি আরও বিস্তৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষার কাজে সরকার সবরকম সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে করে যাবে।

'মানবাধিকার সবার জন্য সর্বত্র সমানভাবে' এই মহান প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৩য় পঞ্চবার্ষিকী কৌশলপত্র ২০২২-২০২৭ প্রণয়ন করেছে। এখানে বিস্তৃত পরিসরে ৮টি কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে মানবাধিকার সংস্কৃতি তৈরি, নারী, শিশু, প্রবীণ ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের মানবিক দিক ও অভিবাসী কর্মী অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এছাড়াও, কমিশন কর্তৃক গৃহীত অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল প্রতিটি জেলায় মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি গঠন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।আমি আশা করি, উক্ত কমিটির মাধ্যমে কমিশন তার কর্মকান্ড আরও জোরালোভাবে চালিয়ে যাবে এবং সারা দেশের যে কোন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনে সোচ্চার থাকবে।

মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে এই বছর গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

আনিসুল হক, এমপি 22/12/2023

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

মানবাধিকার শব্দটি শাশ্বত। মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে অধিকারের নিবিড় সম্পর্কের কারণেই 'মানবাধিকার' সর্বজনীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায় যা ১৯৪৮ সালে ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সুনির্দিষ্টকরণ হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫০ সালে এই দিনটিকে জাতিসংঘ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। সেই থেকে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর সারা বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার নির্দেশিকা হিসেবে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র একটি অনুসরণীয় দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবর্তিত ও গৃহীত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনবদ্য দলিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়: বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানেও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ধারণার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯" দ্বারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ বছর বেশ কিছু দৃশ্যমান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর। স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির আওতায় দুই দেশের মানবাধিকার কমিশন/কমিটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আলোকে নিজ নিজ জাতীয় আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ, মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং যৌথ গবেষণা সম্পাদন, যৌথভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মিডিয়া কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যৌথভাবে সম্পাদন করতে পারবে। এছাড়াও, সারা দেশের ১১ টি জেলায় মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির সাথে মতবিনিময়; কাশিমপুর কারাগারসহ বিভিন জেলায় কারাগার পরিদর্শন; রাঙামাটি জেলায় গণশুনানি আয়োজন; ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউও-এর চতুর্থ পর্বে প্রতিবেদন দাখিল; শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর; যাত্রাবাড়ীর তেলেগু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশনে সুপারিশ প্রেরণ; ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ভাংচুরের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রেরণ; বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় এ বছর।

আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করলে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবো; যা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথকে আরো সুগম করবে।

এবারের মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

মোঃ সেলিম রেজা
সার্বক্ষণিক সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারা দেশে মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমাদের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কমিশন দেশের আপামর জনসাধারণের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

"কাউকে পেছনে ফেলে নয়" এই মতাদর্শকে সাথে নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারের সংশিষ্ট দপ্তরের সাথে কাজ করছে। মানবাধিকার সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখতে মানবাধিকার চর্চার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নারী, শিশু, দলিত, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রবাসী কর্মীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় ১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি নিয়মিত পরামর্শ সভার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করছে। সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে কমিশন। বর্তমান কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দেশের যে কোনো প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অবগত হওয়ার সাথে সাথেই সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেখানে সকল মানুষের সম-অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হবে। এই লক্ষ্য পূরণে বর্তমান কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই অংশ হিসেবে কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও সহায়-সম্বলহীন, আর্থ-সামাজিক ও অবস্থানগত কারণে মামলা করতে অসমর্থ ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ, দলিত, হিজড়া ও প্রতিবন্ধী মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও কমিশন বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উপস্থাপন করছে।

কমিশন বিশ্বাস করে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকশিত হবে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, মানবাধিকার সংস্থা, এনজিও, আইএনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি, মানবাধিকার দিবস ২০২৩ এর অনুষ্ঠান আয়োজনে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ সেলিম রেজা

মানবাধিকার এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক্তিয়ারাধীন আপস বেঞ্চ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সভাপতি, আপস বেঞ্চ

মানবাধিকার কী? ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই মানবাধিকার। মানবাধিকার হলো মানুষের অধিকার। এটা সর্বজনীন একটি অধিকার, মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ জন্মের সাথে সাথেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে এই অধিকারগুলো অর্জন করে। এই অধিকারগুলো কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র কখনও কারও কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। কেউ এই অধিকারগুলো ত্যাগও করতে পারে না। কোনো নাগরিকের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে দেশের প্রচলিত আইন ও আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ২য় এবং ৩য় ভাগে মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে। আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে স্পষ্টত উল্লেখ আছে প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে। আমাদের সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫ নং ইত্যাদি অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে। তাছাড়া ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এ জন্য ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মানবাধিকার অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন ব্যক্তির জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক অনুসমর্থিত। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের মূলনীতিগুলোকে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং নাগরিকের মানবাধিকারের সুরক্ষায় বিভিন্ন বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সরকারি, বেসরকারি দপ্তর ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে থিমেটিক কমিটি পুনর্গঠন করেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও অবৈতনিক সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় যথাক্রমে ফুল বেঞ্চ, বেঞ্চ-১, বেঞ্চ-২ ও আপস বেঞ্চ শিরোনামে ৪টি বেঞ্চ পুনর্গঠন করা হয়েছে।

দেশের কোনো নাগরিকের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে কিংবা মানবাধিকার ভঙ্গ হলে সে ক্ষেত্রে অধিকার বাস্তবায়ন বা অধিকার বলবৎ করার ক্ষেত্রে যদি কোর্ট-কাছারিতে না যেয়ে পক্ষদের মধ্যকার বিরোধ সালিশ বা সমঝোতার ভিত্তিতে আপস করতে চান সে ক্ষেত্রে পক্ষদের মধ্যকার বিরোধটি নিষ্পত্তি বা সমঝোতার জন্য আপস বেঞ্চে পাঠানো হয়। আপস বেঞ্চ পক্ষদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধটি উভয় পক্ষকে শুনানি করে তাদের মধ্যে বিরোধটি আপস নিষ্পত্তি করে দেন। এতে অতিদ্রুত বিনা খরচায় ও স্বল্প পরিশ্রমে পক্ষদের মধ্যে বিরোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যায়। আমাদের দেশে উচ্চ আদালতে এবং নিম্ন আদালতে সর্বমোট ৪২,০৫,২৭৪টি মামলা বিচারাধীন। বিচারকের স্বল্পতা, আইন ও বিধি প্রয়োগের জটিলতায় মামলার দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। ফলে অর্থ, সময় ও শারীরিক শক্তির অপচয় ঘটে। আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হতে মামলার পক্ষদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পক্ষগণ তাদের আইনি প্রক্রিয়ায় অধিকার বাস্তবায়নে আর্থিক, শারীরিক শক্তির অপচয় এবং কালক্ষেপণ করে, ফলে পক্ষগণ অধিকার বাস্তবায়নে হতাশ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনের আপস বেঞ্চ পক্ষদের মধ্যকার বিরোধগুলো অর্থব্যয় ছাড়া অতি অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে পক্ষদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে শান্তি এনে দিতে পারেন। তাছাড়া সামান্য ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কোর্ট-কাছারিতে মামলা দায়ের করতে গেলে মামলা দায়েরের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এতে মামলার জট ও মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়।

আপস বেঞ্চ, ফৌজদারি ও দেওয়ানি প্রকৃতির তুচ্ছ ও ছোট-খাটো মামলাগুলো নিষ্পত্তি করে দিলে কোর্ট-কাছারিতে মামলা দায়েরের সংখ্যা হ্রাস পাবে। তাছাড়া আপস বেঞ্চে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে পক্ষদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিরোধ সমাধান হয়ে যায়, ফলে উচ্চ

আদালতে আপিল, রিভিশন কিংবা রিভিউ করার প্রয়োজন হয় না। এতে পক্ষগণ অতি সংক্ষেপে তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আপস বেঞ্চের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করে কোর্ট-কাছারিতে মামলার জট কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কম সময়ে বিনা খরচায় স্বল্প পরিশ্রমে তাদের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা দিতে পারে। এমন কি তুচ্ছ ফৌজদারি মামলা এবং দেওয়ানি মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায়ও পক্ষগণ আপস বেঞ্চের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করে ও দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাগুলোর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারে।

আপস বেঞ্চে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ: আপস বেঞ্চ দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানির ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করেও থাকে। আপস বেঞ্চে প্রতিপক্ষের উপর নোটিশ জারির মাধ্যমে পক্ষগণকে উপস্থিত ও শুনানি করে বিরোধের বিষয় নিষ্পত্তি করে। কিন্তু কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু করার কোনো সুযোগ না থাকায় প্রতিপক্ষগণ আপস বেঞ্চে হাজির না হলে তখন বিরোধটির আপস নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে পক্ষগণ কোর্ট-কাছারিতে শরণাপন্ন হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া কতিপয় আইনজীবী বা সমাজের কিছু টাউট-বাটপার সুবিধাভোগী মানুষ তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে মানবাধিকার কমিশনের আপস বেঞ্চে হাজির হতে অনুৎসাহিত করত মামলা কোর্ট-কাছারির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য কুপরামর্শ দিয়ে থাকে। ফলে আপস বেঞ্চের পক্ষ বিরোধীয় বিষয়টি পক্ষদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেয়া সম্ভব হয় না।

এ ক্ষেত্রে সমাজের মানুষদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।

একজন ওয়ালী আহাম্মদের মানবাধিকার

মো. আশরাফুল আলম
সচিব (ভারপ্রাপ্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে এসে ভিন্ন ধরনের কাজের ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি তা বলাই বাহুল্য। আমরা যারা বিচার বিভাগে কাজ করি তাদের সাধারণত বিচারপ্রার্থী মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ সব সময় হয় না। সেই কারণে মানবাধিকার কমিশনে আমার পোস্টিং হবার পর মনে মনে সিদ্ধান্ত নেই আমি সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব। ২০২১ সালের শেষের দিকে এক ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে শুনে আমি তাকে আমার চেম্বারে ডেকে পাঠাই। ভদ্রলোকের বয়স আনুমানিক ৬৫/৬৬ বছর, নাম ওয়ালী আহাম্মদ। খুবই ভদ্র ও বিনয়ী আচরণ। কথা বলার পরিমিতিবোধ যথেষ্ট। তার কথায় যা বুঝতে পারলাম তা এ রকম- তিনি ঢাকা শহরে এক টুকরা জমির মালিক। সেই জমির পার্শ্বে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তার হাউজিং স্টেট অবস্থিত। তিনি তার হাউজিং এর জায়গা বড় করার জন্য তার জমি ০৩/১১/১৯৯১ তারিখে দিবাগত রাতে আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকায় তার কেয়ারটেকারকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে বাঁশের বেড়া ও টিনের ঘর ভেঙ্গে বেদখল করে। তিনি ঐ দিনই থানায় জিডি করেন। জবর দখলকারীদের সাথে দেন দরবার করে জমি ফেরত পেতে ব্যর্থ হয়ে বাধ্য হয়ে ঢাকা জেলার যুগ্মজেলা ও দায়রা জজ আদালতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করেন। ফৌজদারি আদালতে সিআর মামলা করেন। দখল পুনরুদ্ধারের মামলাটি বিভিন্ন আদালতে ঘুরে অবশেষে ২৪/০৬/২০০৮ সালে বিচারিক আদালত তার মামলাটি খারিজ করে রায় দেন। সেই রায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন দায়ের করেন। উক্ত সিভিল রিভিশনটি উভয় পক্ষের শুনানি অন্তে ০৬/০২/২০১২ ইং তারিখে জরিমানাসহ Rule absolute করে ৬০ দিনের মধ্যে বাদীকে তার জমির দখল বুঝে দেওয়ার জন্য বিবাদীদের নির্দেশ প্রদান করেন। তখন বিবাদী জবরদখলকারী পক্ষ মাননীয় আপীল বিভাগে Civil petition for leave to appeal দায়ের করলে তা উভয় পক্ষের শুনানি অন্তে গত ১৬/১১/২০১৪ ইং তারিখে dismissed হয়। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রখ্যাত বিজ্ঞ আইনজীবীগণ লিভ পিটিশনকারী পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত রায়ের পরে বাদী তার জমির দখল বুঝে পাওয়ার জন্য বিচারিক আদালতে ডিক্রি জারির মামলা করেন। সেই জারি মামলার কার্যক্রম জবর দখলকারী পক্ষ স্থগিতের জন্য মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে ২০১৫ সালে একটি সিভিল রিভিশন দায়ের করে স্থগিতাদেশ হাসিল করেন। উক্ত স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে বাদী ওয়ালী আহাম্মদ আবারও মাননীয় আপীল বিভাগে Civil petition for leave to appeal দায়ের করলে তা গত ২৪/০১/২০১৬ ইং তারিখে উভয় পক্ষের শুনানি অন্তে কতিপয় নির্দেশনাসহ নিষ্পত্তি হয়। মাননীয় আপীল বিভাগের আদেশ নিম্নরুপ

"We direct the executing Court to proceed with the execution case in accordance with law and make over possession to the decree holder Wali Ahmed without delay."

উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পর বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বিধি মোতাবেক নালিশী সম্পত্তি পুলিশ ও প্রশাসনের উপস্থিতিতে বাদী ওয়ালী আহম্মদকে দখল বুঝিয়ে দেন। জবর দখলকারী পক্ষ ইতোমধ্যেই নালিশী জমি নিয়ে একটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করেন। আবার ২০১৫ সালে বাদীর প্রাপ্ত রায় ও বাদীর দলিল বাতিলের জন্য তৃতীয় পক্ষ দ্বারা একটি মামলা করান যা এখনও চলমান আছে। উল্লেখ্য যে বাদী ওয়ালী আহাম্মদের জমি ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলার তফসিলের জমি পৃথক পৃথক এমনকি ২০১৫ সালে দায়েরকৃত মামলার জমির সাথে বাদীর মামলার জমির কোন মিল নেই। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলার বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ সিভিল রিভিশন মামলায় বিস্তারিত আলোচনা করেই বাদীর পক্ষে রায় দেন। ০৩/১১/১৯৯১ সালের শেষ রাত্রে যে লড়াই শুরু হয় তা অবশেষে গত ০৮/০৩/২০১৬ ইং তারিখে আদালতের মাধ্যমে বাদীর দখল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে শেষ হয়। ইতোমধ্যেই বাদীর জীবন থেকে ২৪টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আর্থিকভাবে হয়েছেন নিঃস্ব। পারিবারিক জীবন হয়েছে তছনছ। সবকিছু হারিয়েও তিনি থামেননি। ঢাকা শহরে ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে কতমাত্রায় লড়াই করতে হয় তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কারো বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। ভূমিদস্যুদের কাছে যেখানে বড় বড় রথি-মহারথিরা আত্মসমর্পণ করেন, হতোদ্যম হয়ে পড়েন, সেখানে একজন সাধারণ ওয়ালী আহাম্মদ এর লড়াই বিশেষ সম্মানের। ওয়ালী আহাম্মদ দীর্ঘ লড়াই শেষে যখন তার জমি বুঝে পেয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছেন এমন সময় বৈশ্বিক মহামারী করোনার থাবায় গোটা পৃথিবী আবারও অচল হয়ে পড়ে। ঘর থেকে বেরোনো নিষেধ। এই সুযোগে ঐ ভূমিদস্যু গ্রুপ আবারও সুযোগের সৎ ব্যবহার করে রাতের আধারে ওয়ালী আহাম্মদের ঘরে ভূমিদস্যুর কেয়ারটেকার ঢুকিয়ে বেদখল করার চেষ্টায় আছেন। আবারও ওয়ালী

আহাম্মদ এর লড়াই শুরু হয়। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ব্যর্থ হয়ে মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করে জানানোর জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে বললে তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার এসিল্যান্ডকে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেন। এসিল্যান্ড যথারীতি তদন্ত করে প্রতিপক্ষের কথার গুরুত্ব বেশি দিয়ে মাননীয় আপীল বিভাগের রায়, আদালত কর্তৃক দখল ইত্যাদি বিবেচনায় না নিয়ে পক্ষদের মধ্যে দেওয়ানি মামলা চলমান দোহাই দিয়ে একটি দায়সারা গোছের রিপোর্ট দিলে মানবাধিকার কমিশন উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করে অভিযোগটি নথিভুক্ত করে। ওয়ালী আহাম্মদ এর লড়াই শেষ হয় না। হার না মানা ওয়ালী আহাম্মদ আবারও দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকেন। চব্বিশ বছরের লড়াই শেষে মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগ থেকে রায় প্রাপ্তির পরে নালিশী জমিতে দখল পাওয়ার পরেও তা আবারও একই পক্ষদের দ্বারা বেদখল হওয়া ও থানা পুলিশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোনো প্রতিকার না পাওয়া কিসের আলামত? ওয়ালী আহাম্মদ কি আবারও দখল পুনরুদ্ধারের মামলা করবেন নাকি অবৈধভাবে আইনগত দখলকারীকে উচ্ছেদ করা নীরবে মেনে নিবেন? দীর্ঘ লড়াই এ শক্তি ক্ষয় হয়েছে। ডায়াবেটিস বেড়ে মাঝে মাঝে হাইপো হয়। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। সেই মনোবল, অর্থ, শারীরিক সামর্থ্য কিছুই এখন তার সাথে নাই। বয়স এখন ৬৮ বছর। চোখেও ঝাপসা দেখেন। মানবাধিকার কমিশন, রাষ্ট্রের পুলিশ-প্রশাসন, কোর্ট কেউ তার পাশে যথাযথ সদিচ্ছা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে না। অসহায় ওয়ালী আহাম্মদের লড়াই কি আইনের লড়াই না? মানবাধিকারের লড়াই না, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই না? তবে আমরা কেউ কেন তার পাশে দাঁড়াচ্ছি না? তার লড়াইটা এগিয়ে নেওয়ার সাথী হচ্ছি না। রাষ্ট্র কি সমসময় দুষ্টের পালক হবে? দেওয়ানি আদালতের বিচার কি আইনের মারপ্যাঁচে প্রকৃত বিচার প্রার্থীর কাছে অধরাই থেকে যাবে? ওয়ালী আহাম্মদ মাঝে মাঝে আমার কাছে আসেন। আমি ভালো ব্যবহার ও মনে সাহস ছাড়া কিছুই দিতে পারি না। সে মাঝে মাঝেই আমাকে প্রশ্ন করে "সন্ত্রাসী, গুণ্ডা, ভূমিদস্যুরাই কি জিতে যাবে, আমি আর কয় দিন" আমি তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারি না, আমার বড় অসহায় ও অস্থির লাগে। কেউ কি আছে...?

পুনশ্চ:- আনন্দের বিষয় হচ্ছে ওয়ালী আহাম্মদের আর্তনাদ শুনতে পেরেই কিনা জানি না, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাদের প্যানেল আইনজীবী দিয়ে ওয়ালী আহাম্মদের জমি পুনরুদ্ধারে তার পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন ও মানবাধিকার

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

এজেন্ডা ২০৩০ বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) নামে পরিচিত যা পৃথিবীব্যাপী টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সকল রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন ধারণার মূল বিষয় হচ্ছে ন্যায্যতার ভিত্তিতে মানুষের আর্থসামাজিক ও মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা এবং তা এমনভাবে করা যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় এবং পৃথিবীর জীবন সহায়ক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াসমূহ বিদ্যমান ও কার্যকর থাকে। টেকসই উন্নয়নের ধারণা অনুসারে এ প্রজন্মকে এমনভাবে আর্থসামাজিক প্রয়োজনসমূহ মেটাতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ তাদের আর্থসামাজিক প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটাতে সক্ষম হয়। এসব ধারণার সার্বিক বিচারে টেকসই উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভ চিহ্নিত করা যায়: অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত। সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনটি স্তম্ভকে সমন্বিত নীতি-কাঠামোর আওতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে-টেকসই উন্নয়নের মূল কাজ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্বে বার্ষিক মাথাপিছু আয়ই ছিল একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক বা মানদণ্ড। কিন্তু টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে-এর ধারণাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যাগত পরিমাপের চেয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থাৎ সবার কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। অতএব, এখন উন্নয়নে সামাজিক কল্যাণ ও পরিবেশগত ভারসাম্যের বিষয়টি প্রধান বিষয় হয়ে উঠছে। উন্নয়নের ধারাকে এমনভাবে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা চলছে যাতে উন্নয়ন টেকসই হয়। টেকসই উন্নয়নের এই ২০৩০ এজেন্ডা- জাতিসংঘের সনদ, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮ (UDHR), আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ ও কাউকে পিছিয়ে না রাখার (No one will be left behind) অঙ্গীকারসহ আর্ন্তজাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ডকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। টেকসই উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে সামাজিক উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- এ কারণে যে, এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও বৈষম্য নিরসনের মূল চাবিকাঠি।

এই টেকসই উন্নয়ন (SDGs) হলো মানবাধিকার প্ল্যাটফর্ম। পৃথিবীর একটি স্বনামধন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান-ডেনিশ ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস (DIHR) একটি বিস্তৃত কাঠামো তৈরি করেছে- যেখানে বলা হয়েছে যে ১৬৯টি টেকসই লক্ষ্যের (SDGs) মধ্যে ১৫৬টি লক্ষ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মানে শতকরা ৯২% ভাগ লক্ষ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড ও মূলনীতিকে অগ্রসর করবে। টেকসই উন্নয়ন (SDGs) অর্জনে বাংলাদেশ যথেষ্ট সচেনতমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শিশুমৃত্যু হার রোধে সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে এবং মাতৃমৃত্যু হার রোধে অগ্রসর হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জন করেছে। এটি নারী পুরুষের সমতা অর্জনের অনেক সফল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বহির্বিশ্বে তার ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে। টেকসই উন্নয়নের সাথে সংহতি রেখে মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের আগামীর পথচলা আরো সুদৃঢ় হবে এটাই আমার প্রত্যাশা। মানবাধিকার সুরক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এছাড়াও নীতি ও আইনের সঠিক বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা ও প্রতিটি মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার হলো মানবাধিকার, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এই মানবাধিকার আবার বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। সহজভাবে দেখতে গেলে বিভিন্ন ধরনের অধিকার হলো- জীবনধারণের অধিকার, স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, চলাফেরার অধিকার ইত্যাদি। আবার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অধিকারও মানবাধিকার। এই বিভিন্ন ধরনের অধিকার একটি অপরটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অর্জন টেকসই হয় না। তাই আমি মনে করি টেকসই উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণ সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে।

শিক্ষা যখন মানবাধিকারের মূল চাবিকাঠি

মেঘনা গুহঠাকুরতা
সাবেক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ

শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার যা কিনা অন্যান্য অধিকার অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষার্জনে মানুষ সচেতন হয়, নারী অধিকার ও শিশু সুরক্ষার পথ সুগম হয় এবং তাদের জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত ন্যায়বিচার বোধ জাগ্রত হয়।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের দিকে যদি তাকাই তখন দেখি যে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ মোটামুটি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে। শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণের মাত্রা প্রায় শতভাগের কাছে পৌঁছেছে তবে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ার মাত্রা এখনও শতকরা ৮০ ভাগ ছাড়িয়ে যায়। আরও চিন্তার বিষয় হচ্ছে ছেলেরা শিক্ষাক্রমে স্বাভাবিক বয়স বজায় রাখতে পারছে না। এর কারণ হতে পারে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করা। সুতরাং যদিও আমরা মানবাধিকার মূলনীতি অনুযায়ী বিশ্বাস করি শিক্ষা একটি সর্বজনীন অধিকার, বাস্তবে এই লক্ষ্যপূরণে এখন ঘাটতি দেখা যায়। এর কারণ মূলত দারিদ্র্য ও অভাব। তবে এ বাদেও আমাদের দেশে রয়েছে কিছু সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যারা নানারকম বৈষম্যের শিকার হয় এবং এর ফলে নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারে না। আমাদেরকে এদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

আমি নিচে দুটো ঘটনা তুলে ধরবো যার মাধ্যমে আমরা এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর সমস্যা বুঝতে পারি, (১) দলিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত থেকে (২) সুদূর পল্লীতে অবস্থানরত কিছু অভাবগ্রস্ত পরিবারের জীবন থেকে।

প্রথম কাহিনিটি ঘটে যশোর সদরের একটি গ্রামে যেখানে বাস করে কাওড়া বা কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের কিছু পরিবার যারা বংশ পরম্পরায় শুকর পালে ও চরায়। সেখানে নিজ পছন্দেই লিলি বিশ্বাস নামে এক নমশূদ্র পরিবারের এক মেয়ের বিবাহ হয়। স্বামী শুকর পালে ও নানা জায়গায় চরাতে নিয়ে যায়। লিলি বিশ্বাস তার বাবার বাড়ি থাকতেই কিছু লেখাপড়া শিখে এসেছিল। তাই যখন সে শুনল যে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে ব্র্যাক একটি বাচ্চাদের স্কুল খুলবে এবং স্কুলে শিক্ষকদের পরীক্ষা নেবে, লিলি সেই পরীক্ষা দিতে যায়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন জানল ব্যাপারটা তখন লিলির উপর প্রচণ্ড রাগ করলো। বাড়ির বউ হয়ে বাইরে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে কেন? এই বিতর্কে লিলি তার স্বামীর সমর্থন পেল কিন্তু দু'জনেই বাড়িতে টিকে থাকতে পারলো না। দু'জনেই সিদ্ধান্ত নিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার পৃথক সংসার করবে। প্রথম দিকে অন্যের বাসার বারান্দায় থাকতে হয়েছে অনেক দিন। ধীরে ধীরে যখন তারা সংসার জীবনে স্থিত হল ও লিলি দুই সন্তান জন্ম দিল, একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে। তখন তারা সংকল্পবদ্ধ হল যে দুই সন্তানকেই তারা লেখাপড়া শেখাবে। স্কুলে ভর্তি করাবে। তাদের ছোট মেয়ে মিনা রাণী বর্তমানে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাশ করেছে এবং সমাজসেবা কাজে নিয়োজিত আছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশ-মিয়ানমান বর্ডারে অবস্থিত হলুদিয়া পালং ইউনিয়নের একটি গ্রামে। আমরা কয়েকজন জড়ো হয়েছিলাম কিছু অভাবগ্রস্ত পরিবারের মা'দের সঙ্গে যাদের ভাগ্যে স্কুলে যাবার সুযোগ কোনোদিন ঘটেনি। দু'জন মা কেবল তাদের ছেলে ও মেয়েকে পড়াতে পারছে। একজন দুই ছেলেকে মাদ্রাসায় দিয়েছে ও অপরজন তার মেয়েকে সরকারি স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়িয়েছে। ক্লাস ফাইভে পড়া মেয়েটিকে আমাদের সামনে ডাকলাম। কিছু প্রশ্ন করলাম। সেও জবাব দিল। সে বলল ক্লাসে পড়ানো সব বিষয়ের মধ্যে তার পছন্দের বিষয় হচ্ছে ইংরেজি। স্বপ্ন দেখে ডাক্তার হবে। অনেক অনুরোধের পরে পাঠ্য বই থেকে একটি ছড়া বলল। ছড়াটি কবি শামসুর রাহমানের লেখা "রৌদ্র লেখে জয়"। মেয়েটির মৃদু স্বরে উচ্চারিত ছড়াটি আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন তুলল। ক্লাস ফাইভ থেকে উত্তীর্ণ হবার পর মেয়েটি কি আর পড়ালেখা করার সুযোগ পাবে? ওর ডাক্তার হবার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে?

কবি শামসুর রাহমানের কবিতার কলিগুলোই যেন আমাদের বুকের ভেতর অনুরণিত হচ্ছিল :

" কাল যেখানে আঁধার ছিল
আজ সেখানে আলো।
কাল যেখানে মন্দ ছিল
আজ সেখানে ভালো।"

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে কর্মকালীন সময়ে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

নিরূপা দেওয়ান
সাবেক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশা শেষে সবে অবসর জীবন শুরু করেছি, ঠিক তখন ২০১০ সালের ১৮ জুন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক টেলিফোনে আমাকে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করলেন। মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে জানানো হলো, মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাকে নবগঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একজন অবৈতনিক সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন এবং আমি যেন যথা শীঘ্র সম্ভব ঢাকার লালমাটিয়াস্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে এসে যোগদান করি। ২২ জুন মঙ্গলবার ঢাকায় এসে সম্পূর্ণ একটি নতুন কর্মক্ষেত্রে আমার নতুন যাত্রা শুরু করলাম। দেখতে দেখতে কিভাবে ভীষণ ব্যস্ততার মাঝে দু'মেয়াদে ছয়টা বছর কেটে গেল। প্রতিদিন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান অর্জন করে সমৃদ্ধ হয়েছি, আবার অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে তা মোকাবেলার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে। মানবাধিকার লংঘনের অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ের তদন্ত আর মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে ঘুরে বেড়িয়েছি পার্বত্যাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কক্সবাজারের রামু, চট্টগ্রামের বাঁশখালী, চট্টগ্রামের কারাগার, নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলকোট থেকে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের নড়াইল, বরিশাল, পটুয়াখালী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী পর্যন্ত। শিক্ষকতা পেশায় বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার মধ্যেই সীমিত ছিল জ্ঞান। কিন্তু মানবাধিকার রক্ষায় ও উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে নতুন করে দেশের প্রচলিত আইন, সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনে কমিশন আমাকে অনেক সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে কমিশনের সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, সাবেক সার্বক্ষণিক সদস্য অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা জনাব রিয়াজুল হক এবং সকল সাবেক অবৈতনিক সদস্যবৃন্দ একেক জন স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সান্নিধ্যে এবং তাঁদের গভীর জ্ঞান আমাকে নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনে আপ্লুত করে রেখেছিল। তাঁদের কাছে আমি চির ঋণী হয়ে থাকলাম।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, ও গণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের রয়েছে তা কমিশনের সদস্যদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে প্রথম সৌজন্য সাক্ষাতেই তিনি সুস্পষ্টভাবে কমিশনকে জানান। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই বাংলাদেশে মানবাধিকার কমিশনের উপরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অবস্থান থাকতে পারে না। তাঁর এই বক্তব্যে কমিশন উপলব্ধি করে কমিশনের সদস্যদের দায়িত্বের গুরুত্ব কতটুকু। কমিশন বাংলাদেশের নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট ও সজাগ থাকার পদক্ষেপ হিসাবে কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে জেলখানা, থানা-হাজত, ভবঘুরে কেন্দ্র, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি পরিদর্শনের পাশাপাশি সরকারি হাসপাতাল, শিশু ও মাতৃসদন, শিশু সদন ও এতিমখানা, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সরকারি বরাদ্দের যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা নিশ্চিত করার সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি করেছে যা মানবাধিকার সংস্কৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়েছে।

মানবাধিকার উন্নয়নে ও রক্ষায় কাজ শুরু করতে গিয়ে কমিশনকে অনেক সীমাবদ্ধতা আর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে প্রায়ই 'নখদন্তহীন ব্যাঘ্র' এর সাথে তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আমি বিশ্বাস করি, প্রফেসর ড. মিজানুর রহমানের মত একজন দক্ষ শিক্ষক নিজের পেশার প্রতি অকৃত্রিম নিবেদিত আর অকুতোভয় সাহসী ব্যক্তির নেতৃত্বে আমরা আন্তরিকভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সাধারণ মানুষ তথা দরিদ্র, খেটে খাওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথা সমতল ও পার্বত্যাঞ্চলের পোড় খাওয়া, নানা কারণে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর এক আস্থার জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, শত সীমাবদ্ধতা আর প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনেক সফলতা রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সফলতার দায় শুধু কমিশনের সাতজন সদস্যের নয়। এর দায় যেমন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের তেমনি দায় বাংলাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রীয়যন্ত্রের। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠাকে অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও স্বদিচ্ছার, আর প্রয়োজন সকল স্তরের নাগরিকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির। প্রয়োজন দেশপ্রেম আর সহিষ্ণুতার। আসুন আমরা একে অন্যের প্রতি মানবিক আচরণের মাধ্যমে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হই।

Promoting Child Rights as Human Rights of Exploited Children

Prof. Ishrat Shamim
President, Centre for Women and Children Studies

Child sexual abuse and exploitation are issues of grave concern. However, it is underreported due to its clandestine nature and being associated with shame and social stigma. Furthermore, children are afraid to speak out fearing disbelief and retribution. Sometimes the perpetrators try to cover up the situation by falsely accusing the abused child. Child sexual abuse and exploitation are driven by multiple factors including poverty, patriarchal norms that support violence against women and girls, child marriage, exclusion from education, rural-urban migration, criminal activities, and cultural norms which are part of the wider context of discrimination and neglect towards children.

Children are victims of commercial sexual exploitation when they end up on the streets due to poverty, family breakdown, domestic violence, missing or trafficked. It is estimated that there are more than 600,000 street children living in Bangladesh, 75 percent of them living in Dhaka city. Often separated from their families, many of these children migrate to the cities in search of a livelihood. Their work may range from street vending, rag picking, metal work, and transport work, to dealing in drugs. Deprived of their basic rights to health, food and education, street children are particularly susceptible to manipulation, drug addiction, abuse, and exploitation, including commercial sexual exploitation (Bangladesh Institute of Development Studies, 2004, 'Street children in Bangladesh: A socio economic analysis,' Dhaka, BIDS).

Child victim protection serves as a critical means of preventing further exploitation and victimization, including the risk of re-trafficking. It is also intimately tied to a trafficking victim's access to justice, as well as to perpetrators being brought to justice. Protective factors promote well-being and reduce the risk of negative outcomes. Protection offers critical interventions to end trafficking exploitation as well as to support and assist victims to recover after their traumatic experiences, and to reintegrate into their families, communities, and society at large.

The reintegration of sexually abused, exploited and trafficked children is pertinent when trafficked children are either rescued within the country or repatriated. Core component of a comprehensive response to trafficking starts from identification, referral, assistance, and reintegration of trafficking victims. Family plays a crucial role in a child's support, therefore, the key of successful reintegration of a child is an organization's ability to know how to motivate families and communities.

Centre for Women and Children Studies (CWCS) is entrusted to lead the task on Child rights promotion and protection: awareness-raising, education and information as one of the consortium partner in Novel Strategies to Fight Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Crimes and Protect their Victims – HEROES project which is funded by the European Commission (EC) Brussels and managed by Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid, Spain.

In this context, Centre for Women and Children Studies had launched the Red Heart Campaign to Promote Child Rights of Sexually Abused, Exploited and Trafficked Children on 30 July 2022. The mission is to promote child rights and protect children from sexual abuse, exploitation and trafficking both offline and online and we envision to have a world free from child abuse, exploitation and trafficking where children can grow up happy, healthy and safe. We organized 5 Stakeholder Meetings to Promote Child Rights of Sexually Abused, Exploited and Trafficked Children with INGOs and NGOs, young men and women, university students and faculty members, social workers, and parents who are in close contact with children or work with child rights issues. For wider dissemination, we also organized awareness raising campaign meetings with grassroots level women CBOs, national NGOs, youth groups and other child rights activists.

To make the Red Heart Campaign to Promote Child Rights more interactive and visible, we launched the Red Heart Campaign Network on 1 February 2023 to carry forward the mission of the campaign. The main aim is to create active collaboration and participation among child rights activists, researchers, social workers, youth groups, policy planners, media personnel, law enforcing agencies and other key stakeholders. We succeeded in getting responses from home and abroad, and presently we have about 135 network members. We are regularly exchanging and sharing each other's initiatives on child rights issues through our Red Heart Campaign Bulletin and organizing webinars. We are learning from each other the changing scenario of child abuse and exploitation worldwide as well as good practices, for example the issue of online child sexual exploitation and how to keep children safe online which is a problem hardly been discussed openly.

On the eve of the Launching of the Red Heart Campaigm to Promote Child Rights, Prof. Ishrat Shamim declared, "We call upon all to join our Red Heart Campaign movement: Let us put our hearts together to save children from sexual abuse, exploitation and trafficking, and we believe from the core of our hears that we can protect our children."

মানবাধিকার: আমাদের মনন-মগজ-মানসের নবায়ন

কাজী জিয়া উদ্দিন
ডিআইজি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

ভূমিকা

বিশ্বায়নের এ যুগে মানবাধিকার বিষয়টি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আজ বহুল আলোচিত একটি Buzz word এ পরিণত হয়েছে। কিন্তু মানবাধিকার সম্পর্কে অনুপুঙ্খ ও পরিপূর্ণ ধারণা এখনো সকলের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এর যথাযথ চর্চা ও অনুশীলনও সম্যকভাবে দৃশ্যমান নয়। প্রচলিত মানবাধিকার ধারণার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের বিকাশ হচ্ছে নতুন নতুন মানবাধিকার ধারণা ও প্রত্যয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আবির্ভাবে প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়ন এমন এমন জটিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল ধারণা সামনে নিয়ে আসছে যা কখনো কখনো অভিনব বিতর্কেরও সৃষ্টি করছে। যেমন নিম্নে ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের একজন কিশোরী মেয়ের আদালতের কাছে একটি অভূতপূর্ব অধিকার প্রার্থনার বিষয় তুলে ধরা হলো :

"আমার বয়স মাত্র ১৪ বছর। আমি মারা যেতে চাই না, কিন্তু আমি জানি আমি মারা যাচ্ছি। আমি মনে করি, আমার শরীর ক্রেয়ো-প্রিজার্ভ (মৃতদেহ মাইনাস ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিমায়িত করে রাখার পদ্ধতি) করে রাখলে একশত বছর পর হলেও আমাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে। আমি মাটির নিচে সমাহিত হতে চাই না। আমি আরও বাঁচতে চাই। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে আমার ক্যানসার সারিয়ে তোলার মতো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হবে। আমি সেই সুযোগটা নিতে চাই।'

যুক্তরাজ্যে একটি কিশোরী মেয়ে এমন অধিকার চেয়ে আদালতের কাছে উপরিউক্ত চিঠি লেখে। ব্রিটিশ আদালত তার এ অধিকারের পক্ষে স্বীকৃতি দেন। প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত্যুর পর যে অধিকার ভোগ করা হবে, তা কি মানবাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা হবে?

মানবাধিকার অর্থ

মানুষ পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে মানবিক মর্যাদাসহ বেঁচে থাকার জন্য এবং তাঁর স্বাভাবিক গুণাবলি ও বৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে প্রয়োজনীয় অধিকারগুলোকেই বলা হয় মানবাধিকার। মানুষের জীবন, অধিকার, সমতা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাগুলোই মানবাধিকার যা প্রতিটা মানুষের জন্মগত অধিকার। অধিকারগুলো কেউ কখনো কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। মানুষের এ অধিকারগুলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মানবাধিকার হলো জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি, জাতীয়তা, ধর্ম বা অন্য কোনো অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উপলব্ধ প্রাকৃতিক অধিকার। মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, পরাধীনতা ও নির্যাতন থেকে নমনীয়তা, মত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কাজ ও নির্দেশনার অধিকার। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার আইনি ব্যবস্থা নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করার বা নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেয় যাতে এটি মানবাধিকার এবং মানুষ বা গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগগুলো নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। মানবাধিকারের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, কাজ করার অধিকার ইত্যাদি।

মানবাধিকারের তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষের নিঃশ্বাস গ্রহণের মতো, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য বেশ কিছু জন্মগত অধিকার রয়েছে। মানবাধিকার হল মৌলিক অধিকার যা একজন মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির বিকাশের ভিত্তি তৈরি করে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে, প্রতিটি দেশে মানবাধিকার হলো প্রতিটি মানুষের প্রাতিস্বিকভাবে বেঁচে থাকার এবং অস্তিত্বের জানান দেয়ার অধিকার। অগ্রগতির অধিকার একটি অনিবার্য মানবাধিকার যা প্রতিটি মানুষকে এবং সমস্ত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ, অবদান এবং প্রশংসা করার অধিকার দেয়, যেখানে সমস্ত মানবাধিকার এবং প্রয়োজনীয় নমনীয়তাগুলো সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। উপরন্তু, মানবাধিকার সকল নাগরিককে তাদের ধর্মাচার, লোকাচার, সমাজাচার পালনের স্বাধীনতা এবং সমান কাজের সুযোগকে উৎসাহিত করে।

মানবাধিকার, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ও স্বীকৃত অধিকারসমূহ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ফলে নাগরিক অধিকার এবং মানবাধিকার দুইটি পৃথক বিষয়, বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ এর দিক থেকেও এরা আলাদা। রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে সীমিত, স্ব রাষ্ট্রের অর্ন্তগত নাগরিকদের অধিকার। অপরপক্ষে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল অর্থাৎ বৈশ্বিক ও সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার।

মানবাধিকার ধারণার বিকাশ (Evolution of the Concept of Human Rights):

মানবাধিকারের অভিব্যক্তিটি তুলনামূলকভাবে নতুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর এ অভিব্যক্তিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ তথা রেনেসাঁর যুগ

থেকেই মানবাধিকারের ধারণাটি মানব মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। রেনেসাঁ ও গণতন্ত্রের দ্বারা সমৃদ্ধ দার্শনিকগণই সর্বপ্রথম রাজশক্তি এবং ধর্মীয় শক্তির তথা উপাসনালয়ের একচ্ছত্র প্রাধান্যের পরিবর্তে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে শুরু করে। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এ সকল দলিলেরও মূল কথা হচ্ছে, মানুষ এমন কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায় যেগুলো অবিচ্ছেদ্য এবং যেগুলো কখনো পরিত্যাজ্য নয়। যেগুলো কেউ হরণ করতে পারে না।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অভূতপূর্ব অগ্রগতি গোটা মানবসমাজকে এক অভূতপূর্ব আলোকিত যুগে নিয়ে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক লক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখের লেখায় এ কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই মানুষ যে সকল অধিকার স্বভাবতই অর্জন করছে রাষ্ট্র সেগুলো কেড়ে নিতে পারে না। তাদের মতে, জীবনের অধিকার, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেও ছিল। Social Contract বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় এই সকল অধিকার রূপায়নের। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ রাষ্ট্রের কাছে তাদের অধিকারগুলো সমর্পণ করেনি বরং সেগুলো আমানত রেখেছে মাত্র। তারা বলেন, রাষ্ট্র কখনো মানুষের স্বভাবজাত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ মানুষ জন্মেছে বিবেক আর যুক্তি নিয়ে এবং যা কিছু যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধে তা মানবতারই বিরুদ্ধে। বস্তুত স্বৈরাচারী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবতার যে আহ্বান তাই হচ্ছে মানবাধিকারের ভিত্তি।

ক্রমে মানবাধিকারের ধারণা দৃঢ়তা লাভ করে। দাসত্বের এবং দাস ব্যবসার মতো অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ হয়, কারখানা আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রমিকের মজুরি এবং কাজের সময়সীমা নির্ধারিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হয়। এসবই মানুষের স্বভাবজাত অধিকার তথা মানবাধিকারের দাবির পরিণতি।

"To deny people their human rights is to challenge their very humanity." – Nelson Mandela

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয় যেখানে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী "মানবাধিকার অর্থ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন ব্যক্তির জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার।"

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের মূলনীতিগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং নাগরিকের মানবাধিকারের সুরক্ষায় বিভিন্ন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।

Article 19 of the UN's Universal Declaration of Human Rights reads: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media [emphasis added] and regardless of frontiers". States still have the power to decide what government information should be public or protected, but it is widely understood that freedom of expression and freedom of speech are entwined with a free media/press".

স্যামুয়েল হান্টিংটন তার সুবিখ্যাত 'সভ্যতার সংঘাত' (Clash of Civilizations) শীর্ষক এক প্রবন্ধে নতুন বিশ্বব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিন্নতা, সংঘাত ও সংঘর্ষের নতুন পটভূমি তৈরি করবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বহু বিশ্লেষক এই প্রেক্ষিতে মনে করেন, এই বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা পৃথিবীতে 'haves' ও 'have-nots'-দের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলছে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিশ্বগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বাংলাদেশও এর প্রভাব মুক্ত সম্ভব নয়।

উপসংহার

প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডেলানো রুজভেল্ট তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, "স্বাধীনতা মানে সর্বত্র মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব। যারা এইসব অধিকার অর্জন বা এগুলো সুরক্ষায় সংগ্রাম করছেন, তাদের প্রতি আমরা সহযোগিতার হাত বাড়াই। আমাদের অভিপ্রায়ের ঐক্যই আমাদের শক্তি। এই উচ্চ ধারণার পথে বিজয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।"

মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সুফল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। সমাজের সকলের যুথবদ্ধ প্রচেষ্টায় যে কোনো অন্যায় বা অপরাধ নিরসনে এগিয়ে আসতে হবে এবং ধাপে ধাপে একটি শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময় স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। সুশীল সমাজ যা কিনা "Government by proxy" হিসেবে বিবেচিত, মিডিয়া এবং অন্যান্য সকল অংশীজনকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের অংশগ্রহণ এবং মসৃণ সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণে সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পারস্পরিক দোষারোপ কিংবা অযৌক্তিক সমালোচনা কখনোই সাফল্য আনতে পারে না।

প্রসঙ্গত, আমাদের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।" অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিককে মানবাধিকার, আইনের শাসন ও গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে 'Quality consciousness of the citizen' খুবই জরুরি। আমাদের মত একটি Prismatic Society বা পরিবর্তনশীল সমাজে অপরাধ দমন, মানবাধিকার সংরক্ষণ তথা সমাজে শান্তি স্থাপনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্ততা বা জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সকলের পারস্পরিক সমন্বয় যদি যথাযথ আন্তরিক ও ঐকান্তিকভাবে না হয় তবে ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, উন্নয়ন কিংবা গণতন্ত্র কখনোই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হবে না।

আমরা যদি চারপাশের মানুষগুলোর মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে একটি শান্তিময়, নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে সকলে একযোগে এগিয়ে আসি, তাতে সকলের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির উপচেপড়া লভ্যাংশ আমার ভাগেও আসে। মনে রাখতে হবে, পদ্ম দীঘির পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে শাপলাও বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক বৃত্তাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজ ও জনহিতৈষী বিকাশ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি ইতিবাচকতার সূচিমুখ খুলে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। বিভাজন নয়, মেলবন্ধন, এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি ঐক্য ও নির্ভরতার ভিত প্রসারিত করে মানবাধিকার সংরক্ষণে সকল দায়িত্বশীল মহলকে আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে।

আমরা একটি আলোকিত, ন্যায়ভিত্তিক, প্রগতিশীল, সম্প্রীতিময়, সমৃদ্ধিশালী, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখি যেখানে সকল নাগরিকের পূর্ণ মানবাধিকার সমুন্নত থাকবে। ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ, কুসংস্কার, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করে একটি যুক্তিবাদী, আধুনিক, মানবিক ও উদারনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের সবাইকেই শ্রেয়বোধে ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সৎ সাহস, পারস্পরিক বিশ্বাস, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, পছন্দ, অংশগ্রহণ- এ সবকিছুর মাধ্যমে সকলের জন্য একটি 'বিস্তৃত সামাজিক প্রাঙ্গণ' নিশ্চিত করতে হবে। এটাই সুস্থ, নির্মল, প্রাণবন্ত সমাজের চিহ্নায়ক।

"পরশুরাম" ছদ্মনামে রাজশেখর বসু অনেক হাসির গল্প লিখেছেন। তার একটির কিছু অংশ বলছি-পরশুরাম স্বপ্নে এক আজব শহরে হাজির হয়েছেন। তখন সন্ধ্যাবেলা আবছা আঁধারে তিনি শহরের একটি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ একজন লোকের মুখোমুখি হলেন। চমকে উঠে দেখলেন গলা থেকে মুণ্ড খসিয়ে বগলে চেপে লোকটি হাঁটছে। সাহস করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি মুণ্ডটি যথাস্থানে না রেখে বগলে চেপে লুকিয়ে রেখেছেন। বগলে রাখা মুণ্ডটি চোখ পিট পিট করে উত্তর দিল, মুণ্ড যথাস্থানে রাখলে পৃথিবীর সকল অন্যায়, অনিয়ম তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোর চিন্তায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, তাই এটি খুলে রেখেছি।

এই অঞ্চলের মুনি-ঋষিরা এক সময় বলেছিলেন, "বসুন্ধৈব কুটুম্বকম" - অর্থাৎ কেউই শত্রু নয়, সারা জগতই আমার বন্ধু ও আত্মীয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষ বয়সে 'সভ্যতার সংকট' লিখতে গিয়ে বলেছেন, "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"। তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছেন, 'পূর্ণ বিকশিত সুষমামণ্ডিত মানুষ চাই'। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ' এসো মানুষ হই'।

এই কথাগুলো উচ্চারণ সর্বস্ব বাকচাতুরী নয়, মনন উৎসারিত তৃষিত আত্মার ব্যাকুল প্রকাশ। মানুষের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পথে, মননে মানসে প্রস্ফুটিত হওয়ার যাত্রায়, শুভ ও মুক্ত চিন্তার প্রাণস্পন্দন সৃষ্টিতে, মানবিকতার নাড়াচাড়ায়, স্বাধীন ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার আলোকিত প্রাঙ্গণ গড়ে তুলতে সকলের সমন্বিত প্রয়াস এখন সময়ের দাবি।

মাটির সিঁড়ি বেয়ে নক্ষত্রের আকাশ ছোঁয়া সম্ভব, যদি আকাশচুম্বী মননের পরিচর্যা করা যায়।

সর্বজনীন মানবাধিকার: প্রসঙ্গ নারীর মানবাধিকার

মালেকা বানু
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার (UDHR) প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারে সমান। মানবাধিকারকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা না গেলেও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয় এইভাবে যে- মানবাধিকার হলো সর্বজনীন, সহজাত, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য, আন্ত:সম্পর্কযুক্ত এবং আন্ত:নির্ভরশীল সেই সকল অধিকার যা প্রতিটি মানব সন্তান তাঁর ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক অবস্থান, জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে ভোগ করতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্রকে সকল নাগরিকের এই সকল অধিকার ভোগের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষায় তা অনুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং ধ্বংসলীলার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর জন্ম নেয় জাতিসংঘ। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানব জাতির মর্যাদা রক্ষা এবং মানবাধিকারকে সুরক্ষা দেবার জন্য মর্যাদা, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এই চারটি নীতির উপর ভিত্তি করে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করে।

প্রসঙ্গত মানবাধিকারের ধারণা বিষয়ে এবং মনুষত্বের অবমাননা রোধকল্পে করণীয় ঠিক করতে বহুযুগ ধরেই চিন্তা-ভাবনা চলে আসছে। মূলত: মানবাধিকারের বিষয়টি দীর্ঘসময় ধরে বহু আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ বা বিস্তৃতি লাভ করেছে যা এখনও চলমান।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়েছে ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবের 'সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর' আদর্শবোধকে ধারণ করে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে জাতিসংঘে আরো ৯টি মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব এই সকল মানবাধিকার সনদসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে দেশে সকল মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করা।

এই ৯টি মানবাধিকার সনদের অন্যতম একটি সনদ ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের মৌলিক মানবাধিকার সনদ (CEDAW) যা অন্যান্য মানবাধিকার সনদের মতই সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পরিপূরক হিসেবে গৃহীত হয়। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) -এ বিশ্বব্যাপী নারী-পুরুষের প্রতি বৈষম্যের রূপ, কারণ এবং প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ আছে। তাছাড়াও নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত দুটি সুপারিশ ১৯ এবং ৩৫ এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ইতিহাসের দিক যদি আমরা ফিরে তাকাই তবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ভোটাধিকারের আন্দোলন, জমি-সম্পদ-সম্পত্তির আন্দোলন, উত্তরাধিকারের আন্দোলন, জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, গণতন্ত্র-নাগরিক অধিকারের আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ থাকলেও, সকল ক্ষেত্রে দেশে দেশে নারীর অধিকার, নারীর মানবাধিকারের জন্য আবার নতুন করে আন্দোলন করতে হয়, সংগঠিত হতে হয়, আওয়াজ তুলতে হয়।

১৯৯৩ সালে ভিয়েনাতে জাতিসংঘ আয়োজিত মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে "নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারী নির্যাতন মানবাধিকার লংঘন" স্লোগান দুটি গৃহীত হয়। এই স্লোগান গ্রহণের পেছনে উপস্থিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার কর্মীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর মানবাধিকার লংঘনের নিষ্ঠুর বহি:প্রকাশ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা; যা একটি বৈশ্বিক উপসর্গ। যার উৎপত্তি নারীর প্রতি অধ:স্তন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সংস্কৃতি, প্রথা, নারীর প্রতি ক্ষতিকর চর্চা এবং বৈষম্যমূলক আইনের মাধ্যমে নারীকে অধ:স্তন এবং অবদমিত রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এক্ষেত্রে জাতীয় এবং বৈশ্বিক ধারাবাহিক আন্দোলন এবং উদ্যোগের মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার সুরক্ষা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যার মধ্যে মাইলফলক উদ্যোগ ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং ঘোষণা ও পরিকল্পনা (BPFA), জাতিসংঘের মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের সভায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক সুপারিশ, দেশে দেশে গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, জাতীয় এবং বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (SDG)। এই সকল কর্মসূচি ও ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা প্রদান। যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের নারী-পুরুষ সকলের মানবাধিকার নিশ্চিত হবে।

অব্যাহত নারী আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন এবং এই সকল উদ্যোগ সত্ত্বেও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এখন পর্যন্ত নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন। এক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ মূখ্যত বিরাজ করছে তা হলো-পরিবারে ও সমাজে বিরাজমান পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা যা কিনা নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হিসেবে গণ্য করে এবং কোনোক্রমেই মানুষ হিসাবে সমমর্যাদা দিতে চায় না। বিদ্যমান ভারসাম্যহীন ক্ষমতার কাঠামো ব্যবহার করে নারীর পারিবারিক এবং জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যবহার করে। রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারক এবং বাস্তবায়নকারীদের মধ্যেও জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং নারীর মানবাধিকার বিষয়ক স্বচ্ছ ধারণা ও যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব প্রতীয়মান। যার কারণে নারীর মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে নীতি, কর্মসূচি, প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না। পদে পদে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, মর্যাদা হানি হয়।

নারীর মানবাধিকারকে সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও একটি বড় বাধা। নারী একটি সমশ্রেণিভুক্ত গোষ্ঠী না । নানান পরিচিতির কারণে একই নারী যেমন- একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী, একজন প্রতিবন্ধী নারী, একজন দলিত নারী, একজন আদিবাসী নারী, একজন তৃতীয় লিঙ্গের নারী, ভিন্ন লিঙ্গীয় পরিচয়ের নারী, একজন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী নানাভাবে মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়। এ ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় এনে সকল নারীর মানবাধিকার সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে, প্রয়োজনীয় আইন, কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। মানবাধিকারের শিক্ষাকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ সকল সময়ে নারীর মানবাধিকারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিরাজ করে। ধর্মীয় মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা, নারীর মর্যাদা, ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সূচিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেশে দেশে নারীর মানবাধিকারকে সংকুচিত করার অপপ্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন চলাচল, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা গ্রহণ, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত করছে। বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন করে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, উত্তরাধিকার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান অধিকার প্রাপ্তি, সিডও'র ধারা -২ এবং ১৬ এর (গ) সংশোধন করে পূর্ণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করে চলেছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এবং সাম্প্রদায়িকতার সহাবস্থান চলতে পারে না ।

নারীর মানবাধিকার তথা সর্বজনীন মানবাধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের, তেমনি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সংগঠনের ভূমিকাও অপরিহার্য। তাছাড়াও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো একক এবং যৌথভাবে মানবাধিকার রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটাই প্রত্যাশিত। কোনো অজুহাতেই মানবাধিকার কমিশন তার দায়িত্ব অস্বীকার বা এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ও সর্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও সুরক্ষা দেওয়া এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিভাজন বা বৈষম্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক, জাতীয় এবং বৈশ্বিক বাস্তবতায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে সে দিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

মানব প্রজাতির টেকসই আগামীর জন্য নারীর অধিকার তথা সর্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।

প্রকৃতি ধ্বংসও মানবাধিকার লঙ্ঘন

মুকিত মজুমদার বাবু
চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন

'আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ!'
এই প্রাণের কতটুকু মূল্যায়ন করছি আমরা! কতটুকু রক্ষা করতে পারছি মানবাধিকার!

গাছেরও প্রাণ আছে। অথচ গাছ কাটছি আমরা, বন ধ্বংস করছি। একটা প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে কখনো আমরা আগের মতো বন তৈরি করতে পারি না। অথচ এই গাছের দেয়া অক্সিজেন নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। গাছ কেটে, বন উজাড় করে অক্সিজেনের ভাণ্ডার ধ্বংস করে আমরা মানুষের অধিকার খর্ব করছি।

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে দিন দিন। বন না থাকলে বন্যপ্রাণীও থাকবে না। আমরা অর্থলিপ্সার কারণে বাঘ হত্যা করছি, হরিণ শিকার করছি, হাতি শিকারসহ তার চলাচলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছি বসতি স্থাপনের মাধ্যমে। বিভিন্ন বন্যপ্রাণী মারা যাচ্ছে আমাদের লোভের কারণে। বন্যপ্রাণী বনের ভারসাম্য বজায় রাখে। বনের ভারসাম্য বজায় না থাকলে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকবে না। হুমকির মুখোমুখি হবে মানুষ। এটাও মানবাধিকার লঙ্ঘন।

একজন মানুষ যখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে নানা ধরনের ধূলিকণা বুকের ভেতর টেনে নিচ্ছে, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে তার শরীরের অলিগলি। হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, নিউমোনিয়া, হাঁপানি ইত্যাদি রোগের শিকার হচ্ছে সদ্যোজাত শিশু থেকে বয়স্করা। এর জন্য আমরাই দায়ী। এটাও মানবাধিকার লঙ্ঘন।

পৃথিবী উষ্ণায়ণের কারণেই বাড়ছে উষ্ণতা। বরফ গলছে, পানি বাড়ছে, উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে কোটি কোটি মানুষ। শিল্প বিপ্লবের ফলে আজ আমরা এই সমস্যার মুখোমুখি। এটা কখনোই পরিকল্পিত শিল্পোদ্যোগ নয়। এর জন্য আমরা মানবাধিকারের কাঠগড়ায় শিল্পোন্নত দেশগুলোকে দায়ী করতে পারি।

শব্দদূষণে জটিল অসুখ মানুষের শরীরে বাসা বাঁধছে। স্ট্রোক, হার্ট-অ্যাটাক, বধিরতা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, মানসিক ও প্রজনন সমস্যাসহ নানাবিধ কঠিন অসুখের মূলে রয়েছে শব্দদূষণ। সচেতনতার অভাবে শব্দদূষণ আমরাই করছি। নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছি। কেউ সচেতনভাবে করছি, কেউ অসচেতনভাবে করছি। অন্যের বাঁচার অধিকারকে অবহেলা করাও মানবাধিকার লঙ্ঘন।

দেশের বিভিন্ন নদ-নদীকে আজ আমরা ভাগাড়ে পরিণত করেছি। টনকে টন বর্জ্য ফেলছি, দখল করছি, কারখানার রাসায়নিক বর্জ্যের নালা মিলিয়ে দিচ্ছি নদীর সাথে। ইটিপি ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করছি বেশি মুনাফার আশায়। ফলে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, সেই সাথে নদীর সর্বনাশ ডেকে আনছি, জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছি। এটাও মানবাধিকার লঙ্ঘন।

পাহাড় কাটা, পাহাড়ি বন ধ্বংস করা, সাগর দূষিত করা, শিকার করা বন্যপ্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদেশে পাচার করাসহ ইত্যাদি প্রকৃতি ও পরিবেশ বিরোধী, আইনের পরিপন্থী, মানুষের কল্যাণের পরিপন্থী। মানুষের মঙ্গলজনক জীবনের পরিপন্থী কাজই মানবাধিকার লঙ্ঘন।

আমরা প্রকৃতির সন্তান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকৃতিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করা আর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা একই কথা। তাই আসুন, সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ে তুলি সুস্থ জীবন। রক্ষিত হোক মানবাধিকার। জয় হোক মানবতার।

মানবাধিকার প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার

মনসুর আহমেদ চৌধুরী
প্রতিবন্ধী বিষয়ক মানবাধিকার কর্মী, সদস্য- ডিসএবিলিটি কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল ও
সাবেক সদস্য- জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ক কমিটি (২০০৯-২০১২)

মানবাধিকার জাতি, বর্ণ, ধম, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের অন্যতম আইনগত দায়িত্ব হলো প্রত্যেক নাগরিকের সমঅধিকার, সমমর্যাদা, সমসুযোগ সৃষ্টি করে, বৈষম্যহীন সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রথম পাঁচ দশকের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে। পরিণামে কয়েক কোটি নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়। কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে বাস্তুহারা হয়। কয়েক লক্ষ মানুষ (সৈনিকসহ) আহত হয়ে প্রতিবন্ধিতার স্বীকার হয়েছিল।

বিশ্ব শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে কতিপয় রাষ্ট্র প্রথম বারের মত মানবাধিকার সংরক্ষণ ও জীবনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সর্বজনীন বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার দলিল (৩০টি ধারা) ঘোষণা ও কার্যকর করেন। ইতিহাসে এই দলিল Universal Declaration of Human Rights (UDHR) নামে পরিচিত।

জাতিসংঘ বিশ্বে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং সমাজের উপেক্ষিত, দুর্বল, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন সময়ে ১০টি জাতিসংঘ সনদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করেছে যা জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা।

আইনের নাম	বিশ্বব্যাপী আইনটি কার্যকরের তারিখ	বাংলাদেশে অনুসমর্থনের তারিখ
মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR)	১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (ICERD)	০৪ জানুয়ারি ১৯৬৯	১১ জুন ১৯৭৯
আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (ICESCR)	০৩ জানুয়ারি ১৯৭৬	৫ অক্টোবর ১৯৯৮
নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (ICCPR)	২৩ মার্চ ১৯৭৬	৬ সেপ্টেম্বর ২০০০
নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)	২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১	৬ নভেম্বর ১৯৮৪
নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক, মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে সনদ (CAT)	২৬ জুন ১৯৮৭	৫ অক্টোবর ১৯৯৮
শিশু সংক্রান্ত অধিকার সনদ (CRC)	২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০	৩ আগষ্ট ১৯৯০
সমুদ্রের আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের সনদ (UNCLOS)	১৬ নভেম্বর ১৯৯৪	২৭ জুলাই ২০০১
জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী সনদ (UNCAC)	৩১ অক্টোবর ২০০৩	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (CRPD)	০৩ মে ২০০৮	৩০ নভেম্বর ২০০৭

১৯৭১ সালে ৯ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন...." অতএব দেশে প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, তৃতীয় লিঙ্গের ও দলিত জনগোষ্ঠীকে আইনের দ্বারা বৈষম্য করা যাবে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে সরকার "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩" (উল্লেখ্য বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এ প্রতিস্থাপন করে এবং "নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন,২০১৩ " জাতীয় সংসদ কর্তৃক উপরিউক্ত দুটি আইন গৃহীত হলে সরকার গেজেট দ্বারা আইনসমূহ কার্যকর করে।

তবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) এর লক্ষমাত্রা অর্জন এবং বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যে চারটি স্তম্ভের কথা সরকার অঙ্গীকার করেছে (স্মার্ট সিটিজেন, স্মাট সিটি, স্মাট অর্থনীতি এবং স্মাট সরকার) তা বাস্তবায়ন করতে হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমউন্নয়ন, সমঅধিকার, অংশগ্রহণ, প্রবেশগম্যতা সৃষ্টি ও একীভূত করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সক্রিয় ভূমিকা একান্ত আবশ্যক সরকার জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মর্যাদার সাথে মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করা একান্ত কর্তব্য। অতএব, অধিকার ভিত্তিক, বাধামুক্ত, একীভূত একটি সমাজ গঠনে রাষ্ট্র আরো মানবিক হোক, এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৫
মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে বাংলাদেশের আরেকটি অনন্য উদ্যোগ

এ.কে.এম. মাসুদ আলী
নির্বাহী পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশ
প্রধান পরামর্শক, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা খসড়া প্রণয়ন কমিটি

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২২ বিভিন্ন অংশীজনের উদ্যোগে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির মুখে এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গতি কিছুটা ধীর হয়ে পড়েছিল। এর পাশাপাশি কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে, মানব্ পাচারের নতুন নতুন ধরন দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক পাচার প্রক্রিয়া অন্যতম। এই নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ ২০১৮-২২ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিবেচনায় আনা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, জাতীয় পরিকল্পনার আওতাধীন বেশ কিছু কার্যক্রম ও প্রকল্প পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে । এর পাশাপাশি, ২০২২ সময়কালে, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন জাতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু নতুন প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থা বাস্তবায়ন করা শুরু করেছে - যা জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় আনা জরুরি হয়ে পড়ে। ২০১৮ হতে ২০২২ পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি, ৭ম জাতীয় পঞ্চবার্ষিকীর সময়কালে শুরু হয় তবে তা ৮ম জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল (২০২৫) অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই (২০২২ সালে) বাস্তবায়িত হয়েছে। একারণে, একটি পূর্ণ পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা না করে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২৩-২০২৫ সময়কাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী একটি অন্তর্বর্তী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ফলে ২০২৫ পরবর্তী (৯ম) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পরবর্তীকালের সকল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এটি একটি বড় পদক্ষেপ, এর ফলে স্থায়ীভাবে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হবে।

খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়া: বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণের অনন্য দৃষ্টান্ত

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২২) হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়াটি তথ্য সংগ্রহ পর্যায় হতেই বহুপাক্ষিক ও অংশগ্রহণমূলক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়ার সাথে প্রাসঙ্গিক সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বাহিনী সম্পৃক্ত হয়েছে। অংশীজনের তালিকায় অন্যতম- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কেবিনেট বিভাগ, সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় /স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রভৃতি। এছাড়াও এনজিও, আইএনজিও ও জাতিসংঘভুক্ত সংস্থাসমূহ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বহুপাক্ষিক কর্মশালার মাধ্যমে খসড়া পরিকল্পনাটিকে যথাক্রমে সমৃদ্ধ ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভূ-বৈচিত্র্য ও মানব পাচারের বিবিধ ধরন ও প্রকোপ বিবেচনায় নিম্নের বিভাগসমূহে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়-খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে। বিভাগীয় কর্মশালা আয়োজনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, স্ব স্ব বিভাগীয় প্রশাসনের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা পেয়েছে। এই কর্মশালা সমূহে বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি সহ, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে গঠিত কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, জন প্রতিনিধি, বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিনিধি ও সাংবাদিক প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন । বিভাগীয় কর্মশালার মতামত ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক খসড়াটিকে পুনঃবিন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে, ১৮ই জানুয়ারি ২০২৩, ঢাকায় আয়োজিত একটি জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে খসড়াটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও জাতিসংঘ ভিত্তিক সংস্থাসমূহের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এই কর্মশালাটিতে মোট ৯৩ জন অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৫ এর বিশেষত্ব

প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৫ এর কিছু বৈশিষ্ট্যিসমূহ উল্লেখ করা জরুরি। প্রথমত- এটি ৩ বছর মেয়াদী। এটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে ২০২৫ পরবর্তী সময়কালে জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঁচ বছর মেয়াদে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে। এই বিবেচনায় এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন কর্মপরিকল্পনা । দ্বিতীয়ত; এই কর্মপরিকল্পনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে পতিরোধের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যা স্পষ্টতই মানব পাচারের মূল কারণসমূহকে ঘিরে কাজ করার ক্ষেত্র নির্মাণ করেছে। তৃতীয়ত; এসডিজির পাশাপাশি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় সাধন করে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় বিবিধ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত প্রকল্পকে ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের চলমান কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করায়, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থার মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। একই কারণে, প্রায় ৯৫ শতাংশ কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থার আওতায় সম্পদ বরাদ্দ করা সম্ভব হয়েছে। চতুর্থত; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগকে নেতৃত্বে রেখে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা নির্দিষ্ট কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করায় বস্তুত এটি সকল অংশীজনের মালিকানায় পরিচালিত একাটি প্রক্রিয়া হিসেবে সামনে এসেছে। পঞ্চমত; জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিকে "মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি"র মাধ্যমে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বাস্তবায়নের স্বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর ফলে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত একটি দায়বদ্ধ কাঠামো প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

প্রয়োজন বাস্তবায়ন

মানব পাচার প্রতিরোধের ও দমন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (২০১৮-২২) মূল উদ্দেশ্য ২০১২৩-২৫ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য যথাক্রমে- উদ্দেশ্য-১ : মানব পাচার প্রতিরোধ, উদ্দেশ্য-২ : মানব পাচারে শিকার ব্যক্তির সুরক্ষা, উদ্দেশ্য ৩ : আইনের প্রয়োগ ও সুবিচার, উদ্দেশ্য ৪ : অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব এবং উদ্দেশ্য ৫ : পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। এই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, জাতিসংঘ ভিত্তিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের পাশাপাশি নাগরিকদের সার্বিক অংশগ্রহণ জরুরি। তৃণমূল পর্যায়ের "মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি"কে কার্যকর ও তৎপর করে তোলা ছাড়া নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দুরূহ। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করাই এখন সময়ের দাবি।

মানবাধিকার, কাউকে পেছনে ফেলে নয়

সঞ্জীব দ্রং
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

১.'বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।' ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১নং অনুচ্ছেদে এই কথাগুলো লেখা আছে। কথাগুলো শুনতে সত্যিই সুন্দর। তারপর পঁচাত্তর বছর চলে গেল। আজও পৃথিবীতে সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার বা মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য ও অবিচার দূর হয়নি। আজ আমরা মানবাধিকার দিবস পালন করছি। আর পৃথিবীর অনেক দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে অথবা খাদ্যাভাবে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। একাত্তরের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমরা 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার' অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ এখানে আজও চলমান।

কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতা আছে। কবিতার শিরোনাম, "পান্থজন" । আজ মানবাধিকার দিবসে কবিতাটি তুলে ধরছি,

বহু পথ হেঁটে ওরা পাঁচজন গোধূলিতে
এসে বসে প্রবীণ বৃক্ষের নিচে ক্লান্তি মুছে নিতে।
গাছের একটি পাখি শুধায় ওদের -
"বল তো তোমরা কারা?" প্রশ্ন শুনে পান্থজন
ঝুঁকে পড়ে নিজের বোধের কাছে,
বলে একজন, "হিন্দুত্বের প্রতি আজন্ম আমার টান।"
দ্বিতীয় জনের কণ্ঠ বাঁশির মতন
বাজে, "আমি বৌদ্ধ, হীনযান।"
এবং তৃতীয় জন বলে, "আমি এক নিষ্ঠাবান
বিনীত খ্রিষ্টান।"
চতুর্থ পথিক করে উচ্চারণ, "আমার ঈমান
করেছি অর্পণ আমি খোদার আরশে,
আমি তো মুসলমান।"
পঞ্চম পথিক খুব কৌতুহলবশে
কুড়িয়ে পতঙ্গ এক বলে স্মিত স্বরে, "আমি মানব সন্তান।"

কবির এই কবিতাই সত্য, আমরা মানব সন্তান। আমরা সকলে মানুষ। প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত বা শেষ পর্যন্ত আমরা মানুষ। তবে জগৎ জুড়ে যেহেতু মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈষম্য ও ভেদাভেদ আছে, তাই মানবাধিকার সবখানে, সবার জন্য সমান প্রযোজ্য। অন্যদিকে বাস্তবতা ভিন্ন। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, মানুষে মানুষে বৈষম্য প্রবলভাবে বাড়ছে। আজ যে কন্যা শিশুর জন্ম হবে আফগানিস্তানের কান্দাহারে, আর যে কন্যাশিশু জন্মগ্রহণ করবে নরওয়ের অসলো শহরে বা কানাডার অটোয়াতে, অথবা যে শিশুর জন্ম হবে রুয়ান্ডা, ইথিওপিয়া বা নাইজেরিয়াতে, অথবা যে শিশুটির জন্ম হবে মেলবোর্নে, এইসব শিশু সমান আদর যত্ন, পরিবার ও সমাজের ভালোবাসা, পুষ্টিকর খাদ্য, বস্ত্র, উন্নত বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা, বিশুদ্ধ পানি, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বড় হবে না। কেন হবে না? ওয়ার্ল্ড স্যোশাল ফোরামের স্লোগান ছিল, এ্যানাদার ওয়ার্ল্ড ইজ পসিবল, অন্যরকম পৃথিবী গড়া সম্ভব। বিদ্যমান ব্যবস্থা শুধু বৈষম্যপূর্ণ নয়, নিষ্ঠুরও। জুলাই ২০২৩ সালের ইউনেস্কোর একটি রিপোর্ট দেখলাম। সেখানে বিশ্বের ২০টি দেশের সবচেয়ে সুখী শিশুদের র‍্যাংকিং করেছে। নেদারল্যান্ডসের শিশুরা নাকি সবচেয়ে সুখী শিশু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে ডেনমার্ক ও নরওয়ে। এই র‍্যাংকিং করতে গিয়ে ইউনেস্কো দেখেছে শিশুর শৈশব, গুণগত শিক্ষা, শিশুর খাদ্য ও স্বাস্থ্য, প্রতিযোগিতাহীনতা, আনন্দ-বিনোদন, স্কুলে চাপ, পিতামাতার সুন্দর কর্মময় জীবন ও অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। সুইডেন, জার্মানি, আইসল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এইসব দেশের নাম অনেক আগে। আমেরিকার স্থান নেই ২০টির মধ্যে। এশিয়ার কোনো দেশের নামই নেই। কোনো কোনো রিপোর্টে জাপানের নাম দেখেছি। আমি মানি, সুখী জীবন নিয়ে নানাজনের নানা কথা আছে। মান্না দে'র গানও আছে 'কপালে সবার নাকি সুখ সয় না, সবাই তো সুখী হতে চায়, তবুও কেউ সুখী হয় কেউ হয় না।' ছাত্রজীবনে এই গানটি অনেকবার শুনতাম আর অজান্তে বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস অনুভব করতাম। তারপরও মানবজীবনে নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান, স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ, বিনোদন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা - এইসব অধিকার ও সুযোগ সুবিধা যে সকল রাষ্ট্র মোটের উপর নিশ্চিত করতে পারে, সকলের কাছে এমন রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত হয়। কেন আমাদের মতো দেশের মানুষ উন্নত দেশে মাইগ্রেট করে, কেন

মেধাবীরা দেশে ফিরতে চায় না পড়াশোনা শেষেও, এইসবই তার কারণ। জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণের ৭৫ বছর পেরিয়ে গেছে, এর মধ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু প্রথম অনুচ্ছেদে যে কথাটি বলা হয়েছিল, "বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করে"- কথাটির প্রতিফলন সবার জন্য আজও সমান হয়নি। আমাদের যেতে হবে আরও অনেক অনেক দূর, যেখানে কোনো শিশুকে, কোনো নারীকে, বালক-বালিকাকে তার জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়, লিঙ্গীয় পরিচয় বা ভিন্ন নাগরিকত্বের জন্য আর নিষ্ঠুর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হতে হবে না। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে জাতিসংঘ যে অঙ্গীকার করেছিল মানুষের মুক্তি, সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, তাকে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে নিতে হবে। 'লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড' বা 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়,' সকলকে সঙ্গে নিয়ে ইনক্লুসিভ ও বৈচিত্রপূর্ণ উন্নয়নের দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এসডিজির সারমর্ম হলো যারা পেছনে পড়ে আছে, তাদের সামনের দিকে টেনে নিতে হবে।

২. আমি বলেছি, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" কথাটি যেমন সত্য, তেমনি মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা আছে, এটিও সত্য। তাই সমাজের এই বৈচিত্রকে আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে উদযাপন করতে হবে। শুধু রিকগনিশন করলে হবে না, সেলিব্রেশন করতে হবে এবং এইজন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বৈচিত্রকে প্রমোট করা জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। "Diversity is not a threat, but sources of strength" কথাটি প্রচার করতে হবে সবখানে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে। হিউম্যান রাইটস্ এডুকেশন বা মানবাধিকার শিক্ষা কার্যক্রম এই ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন করার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের সংবিধানে সত্যি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লেখা আছে। সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে আছে,

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২৮। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

আবার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর ২৩ক অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অনুচ্ছেদ ২৮(৪) বলছে, সমাজে অনগ্রসর মানুষ আছেন। সব দেশেই কিছু মানুষ বা সম্প্রদায় থাকেন যারা সমানতালে এগিয়ে আসতে পারেন না। সমাজে নারী, শিশু, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ, দলিত, আমাদের দেশে চা বাগানের শ্রমিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষ, ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের মানুষ, বেদে ও হতদরিদ্র অনেক মানুষ আছেন। রাষ্ট্র ও সমাজকে তাদের কথা বিশেষভাবে ভাবতে হয়। আমাদের দেশেও নারী ও শিশুদের জন্য এবং প্রান্তিক মানুষদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি থাকে। জাতিসংঘের একটি ঘোষণাপত্র আছে, যার নাম সংক্ষেপে সংখ্যালঘু ঘোষণাপত্র বা মাইনোরিটি ডিক্লারেশন। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এই ঘোষণাপত্রের পুরো নাম, পারসনস্ বিলংগিং টু ন্যাশনাল, এথনিক, রিলিজিয়াস এন্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনোরিটিস। এই ঘোষণাপত্রে প্রথম ধারায় বলা আছে, "রাষ্ট্র এইসব সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও অধিকার সংরক্ষণ করবেন। আর এইসব অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।" ভারতে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হয় ১৯৯২ সালে। বর্তমান সরকারও ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.২৯ অনুচ্ছেদে (পৃষ্ঠা ৬৬) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে।" কিন্তু গত প্রায় পাঁচ বছরে এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপের কথা জানা যায়নি। হয়তো আগামীতে এই কমিশন গঠিত হতে পারে।

৩. এই বছর জাতিসংঘ মানবাধিকার দিবসের মূলসুর ঠিক করেছে, Consolidating and Sustaining Human Rights Culture into the Future. এর বাংলা রূপান্তর এরকম হতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য মানবাধিকার সংস্কৃতিকে সংহত ও টেকসই করা। জাতিসংঘ পার্মানেন্ট ফোরাম অন ইনডিজিনাস পিপলস্ বলেছে, বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগণ ঐতিহাসিক অবিচার ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বিশ্বের ৯০টি দেশের ৪৮ কোটি জনগণ এই বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক আচরণের শিকার। এই দীর্ঘ সময়ে তারা তাদের নিজস্ব জগৎ, বসতভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার হারিয়েছে। যে প্রাকৃতিক বনকে তারা বংশ পরম্পরায় তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হিসেবে দেখতো

এবং সেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করতো, সেই সব বন উজাড় হয়ে গেছে অথবা বনভূমির উপর তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে তারা এমন মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। জাতিসংঘ আবার মাদার আর্থ বা ধরিত্রীর জন্য আদিবাসী সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও এই মানুষেরাই পৃথিবীর ৮০ ভাগ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে চলেছে, যদিও এই জীববৈচিত্র্য এখন হুমকির সম্মুখীন।

মহাত্মা গান্ধীসহ অনেকে বলেছেন, একটি দেশ কতখানি গণতান্ত্রিক, উন্নত, সভ্য ও মানবিক, তার বিচার্য বিষয় হলো সেই দেশে ও সমাজে সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা কেমন আছেন? আমি আজ এই লেখা লিখতে গিয়ে যে অনুভূতির মুখোমুখি হয়েছি, তা হলো সমাজের সকলে, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মানুষ, এই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওয়ার্ল্ডভিউ, নিরাপত্তা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার সংকটকে গভীর মর্মানুভূতি ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখবেন। সবচেয়ে গভীর আবেদন হলো, এইসব মানুষের মর্মবেদনাকে ও মানবাধিকারকে ওদেরই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করা।

একাত্তরের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমরা যখন 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার' অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম, তখন মুক্তিযুদ্ধে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য এ দেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পেরিয়ে এসে আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে চলেছে। গারো, সাঁওতাল, উরাও, চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা - এই ছয়টি ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষানীতি, নারী উন্নয়ন নীতি, সপ্তম বা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সংখ্যালঘুদের ইস্যু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা সকলে জানি, দেশের প্রায় ৩০ লক্ষাধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ সকলের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছে না।

৪. আজ মানবাধিকার দিবসে বিনীত আবেদন জানাতে চাই, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি নীতি যে অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উন্নত, তা মূলধারার মানুষকে সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই সমাজের মানুষের অন্তরে এই উপলব্ধি জাগাতে হবে যে তারাও এদেশের নাগরিক এবং এই দেশকে দেবার মতো অনেক কিছু তাদেরও আছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব, তাদের ভাষা, রূপকথা, গল্প, হস্তশিল্প, সংগীত ইত্যাদি দেশের অমূল্য সম্পদ। ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গেজেট অনুযায়ী দেশে ৫০টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ রয়েছেন। তারা ৩৯টি ভাষায় কথা বলেন। এই ৩৯টি মাতৃভাষার মধ্যে ১৪টি বিপন্ন। এইসব ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে মূলধারার মানুষের জীবনের সেতু বন্ধন রচনা করতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রমে এই জরুরি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চালাতে হবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে। ১৯৫৯ সালে জওহরলাল নেহেরু যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তখন ভারতে ট্রাইবালদের জন্য পঞ্চশীল নীতি গৃহীত হয়। সেই নীতির মূল কথা ছিল 'ট্রাইবাল টাচ্'। 'ট্রাইবাল টাচ্' এর মানে হলো, ওদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাদের জীবন ও অধিকারকে দেখা। এর বিস্তৃত অর্থ হলো, ওরা যেভাবে ওদের সংস্কৃতির বিকাশ চায়, সেটিকে মূলধারার সকলে স্বীকৃতি ও সম্মান দেবে। এজন্য স্বীকৃতি নয় যে সেটি প্রাচীন এবং সুন্দর। এই জন্য যে, সেটি ওদের নিজস্ব অর্জন। নেহেরুর পঞ্চশীল নীতিতে যা ছিল তা হলো, ট্রাইবাল সমাজের জমি নিঃশর্তে ওদেরই থাকবে। বহিরাগতদের কাছে ওদের জমি আর হস্তান্তর করা যাবে না। ওদের অরণ্যের অধিকার মেনে নিতে হবে। সমগ্র দেশে ট্রাইবালদের প্রতি বন কর্মকর্তাগণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন। এই নীতিতে ওদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাকুরিতে সুযোগ, শিল্পায়নে উপকার ও সুবিধাদিসহ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে রাষ্ট্রের সবখানে এই মানুষদের সম্মানের সহিত স্বাগত জানানোর কথা।

৫. বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ইনডিজিনাস ও ট্রাইবাল পপুলেশনের জন্য আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ অনুস্বাক্ষর করা। বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে এই কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেন। তবে পরবর্তী সরকারসমূহ এর আলোকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেননি। এই কনভেনশনের মূল কথা হলো, ইনডিজিনাস ও ট্রাইবাল পপুলেশনের জমির কাগজ বা দলিল থাকুক বা না থাকুক, যে জমি ঐতিহ্যগতভাবে ওরা ব্যবহার করে, সে জমি তাদের। আর এই জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।

আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮ অনুচ্ছেদে লেখা আছে, "ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মানমর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।"

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন জরুরি। মানবাধিকারের ভিত্তিকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি হবে মানবাধিকার।

আমরা মনে করি, এখন সময় হয়েছে সংখ্যালঘুদের জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন আনার। ওদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য বিভিন্ন অগ্রাধিকার এজেন্ডা গ্রহণ করা জরুরি। জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে শ্রদ্ধাভরা ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন শুধু সম্ভবই নয়, এটি রাষ্ট্রের পবিত্র অঙ্গীকার হওয়া উচিত। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, ইতিহাস স্বাক্ষী যে, বৈপরিত্য ও বিরোধাত্মক পদক্ষেপ শুধু অকার্যকরই হয় না, বড় ক্ষতি স্বাধন করে। আমরা আশা করবো জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র নিজে সম্মানিত হবে। এভাবে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানের সংস্কৃতি বিকশিত হবে দেশে। আত্ম-পরিচয় নিয়ে কেউ কাউকে অপমান ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না। ভুল ভ্রান্তি হলে তা স্বীকার করে শুদ্ধতার পথে এগিয়ে যাবে দেশ। নিশ্চয়ই একটা রিকনসিলিয়েশন আসবে নাগরিকদের মনে।

ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময়তা: খণ্ডিত আয়নার আখ্যান

সালেহ আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে "ট্রান্সজেন্ডার" শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান "হিজড়া" সম্প্রদায়ের ইংরেজি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। হিজড়া মূলত একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগত পরিচয় যাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য, প্রথা, আইন এমনকি একটি সাংকেতিক ভাষাও রয়েছে। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার মূলত একটি বৈচিত্র্যময় জেন্ডার ভিত্তিক পরিচয় যেখানে একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি তার জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের চেয়ে ভিন্ন জেন্ডার অনুভব করে থাকেন। হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশই ট্রান্সজেন্ডার নারী, কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারগণ হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্য নন। অন্যদিকে কিছু মানুষ যারা জন্মগতভাবে নারী-পুরুষের চেয়ে ভিন্ন যৌন ও প্রজনন অঙ্গ নিয়ে জন্ম নেন তারা মূলত আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষ। কিন্তু নানাবিধ ভুল ধারণার কারণে, বাংলাদেশের হিজড়া, ট্রান্সজেন্ডার এবং আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের একই জনগোষ্ঠীর বলে ধরে নেয়া হয়। এছাড়াও প্রচলিত নারী-পুরুষের ধারণার বাইরে জেন্ডার-ননবাইনারি, কুইয়ার, জেন্ডার-নিরপেক্ষসহ ইত্যাদি আরো লিঙ্গবৈচিত্র্যময় মানুষজন রয়েছেন যাদের ব্যাপারে এই সমাজের বহুবিধ ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান।

বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা প্রায়শই শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, সামাজিক নিরাপত্তা, উত্তরাধিকার ইত্যাদিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক বর্জন, শারীরিক নির্যাতন, বৈষম্য এবং প্রান্তিকতার শিকার হয়। তাদের অনেকেই বেঁচে থাকার জন্য যৌনকর্ম বা অন্যান্য ধরনের শোষণে জড়িত হতে বাধ্য হয়। এতে করে একদিকে যেমন তাদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে, অন্যদিকে কাঠামোগতভাবে পিছিয়ে দেয়ার কারণে নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রে উন্নয়নে তারা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো নারী ও পুরুষের বাইরে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে “হিজড়া লিঙ্গ” হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করে। হিজড়া মূলত একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সামগ্রিক লিঙ্গবৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর একটি অংশ হবার কারণে লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর অন্যান্যরা যারা হিজড়া সংস্কৃতির সাথে জড়িত নয় এমন মানুষজন (আন্তঃলিঙ্গ, ট্রান্সম্যান, ট্রান্সওমেন, নন-বাইনারি, কুইয়ার, জেন্ডার-নিরপেক্ষ ইত্যাদি) এই স্বীকৃতির বাইরে রয়ে গেছে। এর ফলে লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানুষজন বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ-ভিত্তিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটি ধোঁয়াশার মধ্যে পড়ে গেছে। তারা লৈঙ্গিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত নিগৃহের শিকার হচ্ছে তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও ঘৃণার মুখোমুখি হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩ তৈরির মাধ্যমে ‘হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন শুরু করে। ২০২২ সালের জনশুমারিতে প্রথমবারের মত হিজড়া জনসংখ্যা গণনা করা হয়, এতে মোট ১২৬২৯ জন হিজড়া গণনায় স্থান পায়। যদিও এই সংখ্যা নিয়ে খোদ হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যেই বিতর্ক আছে, তারা মনে করছে প্রকৃত সংখ্যা অবশ্যই আরো অনেক বেশি হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, কেবল হিজড়া জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হলে, তাদের বাইরে যে অন্যান্য লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় অন্যান্য মানুষজন রয়েছেন তাদের অবস্থান কোথায়? বিভিন্ন কারণে সমাজে হিজড়াদের কিছুটা হলেও গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় অন্যান্যদের গ্রহণযোগ্যতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাই সকল লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন বাধা বা চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করা জরুরি।

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বৈচিত্র্যময় যৌন অভিমুখ ও লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানুষজন কার্যকরভাবে এখনও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং সামাজিকভাবে সুরক্ষিত নয়। যদিও বাংলাদেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করেছে, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আরও যুগোপযোগী এবং কার্যকর নীতির

প্রয়োজন রয়েছে। সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান। যথাযথ আইনের অভাবে, এই মানুষদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের প্রতি মানবিক আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, সকলের দায়িত্ব।

এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া জরুরি। পরিবার থেকে বিচ্যুত হওয়া রোধ, রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রে নাম ও জেন্ডার পরিবর্তন, অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে আইন ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না করা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও কর্মস্থলে বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধসহ মিডিয়ায় এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়। আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব একটি ঐতিহাসিক সত্য, এবং তা কোনোভাবেই অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। প্রত্যাখ্যান, বঞ্চনা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি এই জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতিদিনের গল্প। কিন্তু এখন সময় হয়েছে আমাদের চিন্তাধারাকে ইতিবাচক করার, মানুষকে খণ্ডিত আয়নায় না দেখে একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসার। স্বীকৃতি, অনুকূল বিধিবিধান এবং অনুশীলন সমাজে লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস করতে পারে এবং প্রগতিশীল সমাজে একজন মানুষ হিসাবে তাদের বিকাশ ও বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য ও সম্ভাব্য আইনি প্রতিকার

এম. রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

আমাদের জাতির পিতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ। যা আমরা একাত্তরের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই বঙ্গবন্ধ যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন তার প্রস্তাবনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"।

সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে;"

২৩ (ক) তে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।

তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার অংশে (২৭) বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২৮ (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

জাতিসংঘ বৈশ্বিক এই বৈষম্যের কথা স্বীকার করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি ঘোষণা করেছে। যার মূল সুর হলো 'লিভ নো ওয়ান বাহাইন্ড' বা কাউকে পেছনে ফেলে নয়, যার সারমর্ম হলো যারা পেছনে পড়ে আছে, তাদের সামনের দিকে টেনে নিতে হবে।

"উন্নয়ন যেহেতু সাংবিধানিক-ন্যায়-নিষ্ঠ-মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট ধারণা, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই জনগণের অংশ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের মালিক। আমরা মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্ভাসিত এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছি। তাছাড়া আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের চার স্তম্ভ (গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা-অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্র) মজবুত করতে বদ্ধপরিকর।

রাষ্ট্রের এই বাস্তবতায় সমাজে এখনো বৈষম্য বিদ্যমান। বিশেষ করে দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিভিন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৮৩৮-১৮৫০ এর মাঝামাঝি বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ সরকার পূর্ববঙ্গে পরিষ্কার পরিছন্নতা, চা বাগানের শ্রমিক ও জঙ্গল কাটার জন্য উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান ও আসাম থেকে আজকের দলিতদের পূর্ব প্রজন্মকে নিয়ে এসেছিল। অভাবী এই অভিবাসীদের এক অংশ বাংলাদেশে তখন থেকে জাত সুইপার, জুতা মেরামতকারী, চা-শ্রমিক নামে অভিহিত-যদিও জাতে তারা ঝাড়ুদার, কুলী ছিলেন না। এরকম সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রয়েছে: তেলেগু, কানপুরী, হেলা, লালবেগী, ডোম, ডোমার, পাশি, বাঁশফোর, হাড়ী, মালা, মাথিকা, সাকালী, সাবেরী, এথলু, গল্লুলু, কাপুলু ও সাচ্চারী, রবিদাস, চা-শ্রমিক ইত্যাদি। ভূমিহীন ও নিজস্ব বসতভিটাহীন এসকল সম্প্রদায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমি, রেলস্টেশনসহ সরকারি খাস জমিতে বসবাস করছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এরা বাংলাদেশের নাগরিকত্বও লাভ করেছে এবং ভোটাধিকারও পেয়েছে। এসব সম্প্রদায় তেলেগু, ভোজপুরী, জোবালপুরী, হিন্দি, সাচ্চারী ও দেশওয়ালী ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সেসব ভাষায় শিশুদের শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। জাতীয়ভাবে এসব ভাষার কোন স্বীকৃতিও নেই। শিক্ষা ও কর্মজগতে বঞ্চনার মাধ্যমে দলিত সম্প্রদায়ের শিশুরা পুরোনো সামাজিক চৌহদ্দিতেই আটকে থাকছে। শহুরে নাগরিক জীবন ও অর্থনীতি সচল

রাখার কাজটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে করে গেলেও ক্রমবর্ধিষ্ণু অর্থনীতির কোন সুফল ভোগ করতে দেয়া হয়নি বরং সমাজের মূল স্রোতধারার মানুষ কর্তৃক তারা অস্পৃশ্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার এবং বহুভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত।

সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য বিলোপে কমিশন বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কমিশন জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনাগরিক জনগোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি থিমেটিক কমিটি গঠন করেছে। থিমেটিক কমিটি সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, কমিউনিটি প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে করা হয়েছে। কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির মানবাধিকার সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে কমিশন পরবর্তীকালে প্রয়োজন মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

এছাড়া দলিতদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার একটি রেস্টুরেন্টে হরিজন সম্প্রদায়ের একটি ছোট শিশুকে তার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে খেতে না দেয়ার ঘটনায় কমিশন অনুসন্ধান করে ঘটনার সত্যতা পায়। এরপর রেস্টুরেন্ট মালিককে ভুক্তভোগী শিশুকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে উক্ত অর্থ বৈষম্যের শিকার শিশুকে হস্তান্তর করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এছাড়া সম্প্রতি রাজধানীর ধলপুরের তেলেগু কলোনিতে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হলে কমিশন হস্তক্ষেপ করে। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলে এর একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান করেন।

বৈষম্যের এই যাতনা যুগের পর যুগ ধরে দলিতরা সহ্য করে চলেছে। উন্নয়নের সুবাতাস সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছালেও দলিত পল্লীতে তার প্রত্যাশিত প্রতিফলন দেখা যায় না। তাইতো তাদের উপর চলমান বৈষম্য নিরসনে এখনো তাদের স্লোগান দিতে হয়। বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের দাবি তাদের দীর্ঘদিনের। এই দাবির সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একাত্ম হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে বারংবার মতবিনিময় করে উক্ত আইনের একটি খসড়া ২০১৮ সালে সরকারের নিকট প্রেরণ করে কিন্তু তা অদ্যাবধি আলোর মুখ দেখেনি।

বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণীত হলেই দলিতদের সকল বৈষম্য হয়তো বিলোপ হবে না কিন্তু বৈষম্যের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এর প্রতিকার মিলবে। ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চনার শিকার ও অপ্রাপ্তিতে নিমজ্জিত জনগোষ্ঠীর প্রাপ্তির খাতায় কিছুতো যোগ হবে! এটাই বা কম কী!!!

প্রতিবন্ধী মানুষের ভোটাধিকার

ফারজানা নাজনীন তুলতুল
উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ভোটার হওয়ার এবং বাধাহীনভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করা সব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা প্রদান করতে না পারলে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু বাস্তবতার নিরীখে আমাদের দেশে স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়সহ সব স্তরের নির্বাচনে প্রতিবন্ধী নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের অবস্থা এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এর মূল কারণ, ভোট প্রদানের পদ্ধতি ও সুবিধাদি এবং উপকরণাদি অনেকাংশেই বাধাহীন, বোধগম্য ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারোপযোগী নয়। প্রতিবন্ধী মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে প্রতিবন্ধী ভোটারের দ্রুত ভোট গ্রহণ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিজস্ব সহকারী, নিচুতলায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সচেতনতা সৃষ্টিসহ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমানে ভোটার নিবন্ধন ফরমের ১২ নম্বরে ভোটার কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার কি না- তা সংযোজন করা থাকলেও মোট প্রতিবন্ধী ভোটারের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। জাতীয় পরিচয়পত্রে ও ভোটার তালিকায় প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণের কোনও চিহ্ন ব্যবহার না করায় ভোটকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ভোটারের চাহিদামত সুবিধাদি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না। চিহ্ন না থাকার কারণে কোন ভোটকেন্দ্রের অধীনে কতজন প্রতিবন্ধী ভোটার আছেন, তাও জানা সম্ভব হয় না এবং সে কারণে ভোটকেন্দ্র প্রতিবন্ধীবান্ধব করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্টেট অব নিউইয়র্ক নির্বাচনী আইন, ২০১১ অনুযায়ী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে টেকটাইল ব্যালট পেপার ব্যবহার করে থাকেন। তথ্য মতে, বাংলাদেশে মোট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩২ শতাংশ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। অতি কম খরচেই সহজে 'টেকটাইল' পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও, অধিকাংশ আফ্রিকান ও এশিয়ান দেশে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ভোট প্রদানে ব্রেইল পদ্ধতি এবং প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ আমেরিকা, জাপান, নেদারল্যান্ডসে ভোট প্রদানে প্রতিবন্ধীবান্ধব ইভিএম মেশিন প্রচলিত আছে।

বাংলাদেশে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২'-এ শুধু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সহযোগী ব্যবহারের বিধান থাকলেও অন্য ধরনের প্রতিবন্ধীদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার উল্লেখ নেই।

এই বৃহৎ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ভোটারের অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের গণতন্ত্র কখনো সুসংহত হতে পারে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হলে নির্বাচন কমিশন পরিপত্র জারি, ভোটার নিবন্ধন বিধিতে পরিবর্তন এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে প্রতিবন্ধী বিষয়ে সংশোধনীর উদ্যোগ নিতে পারে। এছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ বের করা যায়। শুধু তাই নয়, ভোটাধিকার প্রয়োগের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী মানুষ যাতে নির্বাচনে প্রার্থী, সমর্থক, প্রচারক ও নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণসহ নির্বাচনী কার্যক্রমে পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। স্বল্পতম সময়ের মধ্যেও বর্তমান নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যা চরম প্রতিবন্ধী ভোটারকেও ভোট প্রয়োগে উৎসাহিত করবে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬ এবং জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক কভিনেন্টে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরকারী দেশ, যেখানে সব নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভোট দেওয়ার বিষয় উল্লেখ আছে। পাশাপাশি সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ পাস করেছে। এই আইনের ১৬ ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারের কথা বলা আছে। সুতরাং, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা তৈরি করার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমুন্নত হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

অপারেশনের পর ডাক্তারের ভুলে ২০ বছর ধরে পেটে কাঁচি নিয়ে এক নারীর দুঃসহ যন্ত্রণা: ভুক্তভোগী নারীকে এক লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান

সুয়োমটো খু. ০১/২২

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'অপারেশনের পর ডাক্তারের ভুলে ২০ বছর ধরে পেটে কাঁচি নিয়ে এক নারীর দুঃসহ যন্ত্রণা' সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তাৎক্ষণিক সুয়োমটো অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে জেলা প্রশাসক, মেহেরপুরকে বলা হয়। পিত্তথলির পাথর অপারেশন করাতে ২০ বছর আগে ২০০২ সালে মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকে ভর্তি হন চুয়াডাঙ্গার ঐ নারী। অপারেশনের খরচ বহনে একমাত্র সম্বল ১০ কাঠা জমি বিক্রি করে দেন তার স্বামী। এর ২০ বছর পর এক্স-রে করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত ১০/০১/২০২২ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পেট থেকে ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ কাঁচিটি বের করা হয়। ২০০২ সালে পিত্তথলিতে পাথর ও শারীরিকভাবে অসুস্থতার কারণে রাজা ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে গিয়ে চরম অবহেলার শিকার হন। যার ফলে তাকে দীর্ঘ ২০ বছর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ১৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ভিকটিমকে এক লক্ষ টাকা সাময়িক সাহায্য প্রদানের জন্য পরিচালক, রাজা ক্লিনিক, গাংনী থানা, মেহেরপুর-কে বলা হয়। উক্ত নির্দেশনানুযায়ী সাময়িক সাহায্যের উক্ত এক লক্ষ টাকা ভুক্তভোগীর ব্যাংক একাউন্টে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

বিএসএফের গুলিতে চোখ হারানো রাসেল মিয়া পেল এক লক্ষ টাকা

অভিযোগ নং-সুয়োমটো রা-২৭/১৮

"Schoolboy, shot by BSF, Likely to lose eyesight" শীর্ষক শিরোনামে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অভিযোগটি জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়। তদন্তে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান হয়। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে ভারতীয় বিএসএফের রাবার বুলেটে নবম শ্রেণীর ছাত্র মো: রাসেল মিয়া আহত হন।

এতে তার ডান চোখে দু'টি, বাম চোখে একটি এবং কান, মাথা ও সমস্ত মুখমণ্ডলে ৪৮টি পিলেট স্প্রিন্টার আঘাত হানে। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ভুক্তভোগীর বাম চোখে কিছুটা আলো ফিরলেও ডান চোখের আলো ফেরানো সম্ভব হয়নি। ভুক্তভোগী রাসেল মিয়ার বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে যে, বিএসএফের গুলিতে রাসেল মিয়ার চোখ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। এছাড়াও, চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন হওয়ায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ করা হয় প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য।

কমিশন মনে করে জনগণকে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের পক্ষে জননিরাপত্তা বিভাগের তা এড়িয়ে যাবার অবকাশ নেই। কমিশন আইন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ দিয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ১৯ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ জননিরাপত্তা বিভাগের নেই। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে গত ২১ জুলাই, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ফুল বেঞ্চ সভার

সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ১৯ (২) ধারা মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত রাসেল মিয়াকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সুপারিশ করা হয়। ১০/০৮/২০২৩ তারিখে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিএসএফের গুলিতে চোখ হারানো রাসেল মিয়াকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

১০ বছর ধরে গ্রাম ছাড়া ৩০০ পরিবার কমিশনের হস্তক্ষেপে বাড়ি ফেরেন

অভিযোগ নং-সুয়োমটো রা.১১/২০২২

গণমাধ্যমে "শাহজাদপুরে হামলার ভয়ে ১০ বছর ধরে গ্রামছাড়া ৩০০ পরিবার" সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত সড়াতৈল গ্রামের এক "ভিটাবাড়ি পুরো ফাঁকা। হামলা-ভাঙচুরের চিহ্ন এখনো স্পষ্ট। প্রায় ১০ বছর ধরে বাড়িগুলোতে কেউ থাকেন না। বিধ্বস্ত বাড়িগুলো যেন পরিণত হয়েছে 'ভুতুড়ে বাড়িতে'। ঘটনার সূত্রপাত ২০১২ সালে। জমি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে গ্রামের মোল্লা ও ডোকলা (প্রামাণিক) গোষ্ঠীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন প্রাণ হারান, আহত হন শতাধিক মানুষ। এসব ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলাও হয়েছে। এর পর থেকেই হামলার ভয়ে গ্রামছাড়া হয়েছে মোল্লা গোষ্ঠীর প্রায় ৩০০ পরিবার। ১০ বছর ধরে গ্রামের বাড়িঘর ও দোকানপাট ফেলে রেখে বিভিন্ন স্থানে ভাসমান জীবনযাপন করছেন মোল্লা পক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় প্রতিপক্ষের করা মামলায় আদালত থেকে অনেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তবে প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে অনেকেই পালিয়ে জীবনযাপন করছেন। এ বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জকে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, চেয়ারম্যান, ১নং কায়েমপুর ইউনিয়ন পরিষদ মোল্লা ও ডোকলা (প্রামাণিক) গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাহজাদপুর থানা চত্বরে এক উন্মুক্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে শাহাজাদপুর থানার সার্কেল এসপি, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি আপস মীমাংসা করা হয়েছে। তারপর থেকেই মোল্লা ও ডোকলা (প্রামাণিক) গোষ্ঠীর অনেকেই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন এবং উভয় পক্ষই শান্তিপূর্ণভাবে গ্রামে বসবাস করছেন। বর্তমানে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে এবং এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো।

হরিজন শিশুকে রেস্তোরাঁয় খেতে বাধা: কমিশনের হস্তক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু পেল ৫ হাজার টাকা

অভিযোগ নং-রা.০৪/২৩

অভিযোগকারী জানান যে, গত ০৫/০৬/২০২৩ তারিখে হরিজন সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী প্রেম বাবু বাসফোর, বয়স- ০৬ বছর বিদ্যালয় ছুটি শেষে আনুমানিক সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় বন্ধু-বান্ধবের সাথে নাস্তা করার জন্য রংপুরের গংগাচড়া বাজারস্থ পোস্ট অফিস সংলগ্ন জনৈক আব্দুল কাইয়ুমের রেস্তোরাঁয় যায়। সেখানে চেয়ার টেবিলে বসে নাস্তা খাওয়া আরম্ভ করলে হোটেল মালিক তাকে হোটেলে বসে খাবার খেতে বাধা প্রদান করে বলেন যে তিনি হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে। খেতে চাইলে বাহিরে খেতে হবে। পুনরায় হোটেলে খেতে আসলে গলা ধাক্কা দিয়া বের করে দেবে মর্মে হোটেল মালিক হুমকি প্রদর্শন করে।

অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রংপুর জেলার গংগাচড়া বাজারস্থ পোস্ট অফিস সংলগ্ন জনৈক আব্দুল কাইয়ুমের রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে গিয়ে হরিজন সম্প্রদায়ের একটি কোমলমতি শিক্ষার্থী বৈষম্য ও হুমকির শিকার হয়েছে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে বিবেচিত। এ অবস্থায়, উক্ত হোটেলের মালিক জনাব আব্দুল কাইয়ুম কে অদ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে 'কেন তার হোটেলের কার্যক্রম বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না' তার কারণ দর্শাতে সমন ইস্যু করা হয়। সমনটি যথাযথ পদ্ধতিতে জারি করে কমিশনে ফেরত পাঠানোর জন্য অফিসার ইনচার্জ, গংগাচড়া থানা, রংপুর-কে বলা হয়।

শুনানিতে মালিকপক্ষ হাজির হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কমিশনের বেঞ্চ ০২ সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, যেহেতু প্রেম বাবু বাসফোর এর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তাই, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর বিধানবলে ভুক্তভোগী প্রেম বাবু বাসফোরের ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করতে প্রতিপক্ষ মোঃ কাওসার মিয়াকে বলা হয়। উক্ত সাময়িক সাহায্য মঞ্জুরির অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গংগাচড়া, রংপুর এর মাধ্যমে ভুক্তভোগী প্রেম বাবু বাসফোরকে প্রদান করে কমিশনে তার উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্য মালিকপক্ষ মোঃ কাওসার মিয়াকে বলা হয়।

অভিযুক্ত মোঃ কাওসার মিয়া সাময়িক সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গংগাচড়া, রংপুর এর মাধ্যমে ভুক্তভোগী প্রেম বাবু বাসফোরকে প্রদান করেন। এ অবস্থায়, কমিশনের সুপারিশ প্রতিপালন করার জন্য জনাব মোঃ কাওসার মিয়া ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গংগাচড়া, রংপুর-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

কমিশনের হস্তক্ষেপে বয়োবৃদ্ধ বাবা-মা পেল ভরণ-পোষণ

অভিযোগ নং-রা.৬৫/২২

অভিযোগকারী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, অভিযোগকারীর বাবা-মা বয়োবৃদ্ধ ও তার একটি ভাই পাগল হওয়ায় তিনি কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের দেখাশোনা করেন। অভিযোগকারীর আরো ৪ (চার) ভাই বোন থাকলেও তারা বাবা-মার দেখাশোনা করেন না। তার বড় ভাই বর্তমানে স্থানীয় ইউনিয়ন মেম্বার। তিনি প্রায় সময় তার বাবা-মাকে মারধর করেন। অভিযোগকারী বাধা দিতে গেলে তার বড় ভাই তাকেও মারধর করে। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে কয়েকবার অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা পাননি। অভিযোগকারী আইনের আশ্রয় নিতে চাইলে তার ভাই তাকে ও তার বাবা-মাকে হত্যার হুমকি দেয়। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী, তার বাবা-মা ও ভাইয়ের নিরাপত্তায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঈশ্বরদী, পাবনা-কে বলা হলে তিনি জানান যে, উভয় পক্ষ ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে শুনানিতে নিষ্পত্তিকল্পে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:-

১) অভিযোগকারীর বড় ভাই প্রতি মাসে তার বাবা-মাকে নগদ ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে প্রদান করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

২) অভিযোগকারীর অপর এক ভাই প্রতি মাসে তার বাবা-মাকে ০১ (এক) মন করে চাউল প্রদান করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩) অভিযোগকারীর অপর এক ভাই তার বাবা-মায়ের অবশিষ্ট ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

অভিযোগকারীর অভিযোগ সমূহের বিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক নজর রাখবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সুইপার কলোনিতে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পেল মানবিক সহায়তা

অভিযোগ নং-সুয়োমটো রা. ১০/২৩

গত ০২ জুন ২০২৩ তারিখে গণমাধ্যমে "রংপুরের সুইপার কলোনিতে থামছে না আহাজারি" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, রংপুর সিটি বাজারে মাছের ব্যবসা করেন রবিউল ইসলাম। প্রতিদিনের মতো বেচাকেনা শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেন তিনি। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে হাঁপিয়ে উঠা রবিউল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়ির পাশে সড়কে হাঁটতে বের হন। হঠাৎ খেয়াল করেন তার পাশের বাড়িতে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। তিনি যোগ দেন আগুন নেভানোর কাজে। কিন্তু ততক্ষণে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এতে তার (রবিউল ইসলাম) বাড়িতেও আগুন লেগে যায়। আগুন নেভানোর আগেই তার তিনটি থাকার ঘর ও একটি রান্নাঘর পুড়ে ছাই। রংপুর নগরীর নিউ জুম্মাপাড়া সুইপার কলোনিতে (১ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে রবিউলসহ আরও ১০-১২টি পরিবারের সবকিছু আগুনে পুড়ে গেছে। বাদ যায়নি বিছানা, খাট এমনকি রান্না করা ভাতের পাতিলও।

উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো এবং মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, তদন্তের মাধ্যমে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ধারণ এবং উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে মানবিক সাহায্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত কার্যক্রম কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, রংপুর-কে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, গত ০১/০৬/২০২৩ তারিখে সংঘটিত রংপুর মহানগর, জুম্মাপাড়ায় সুইপার কলোনিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসক রংপুরসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরসহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে জানা যায় রান্নাঘরের আগুনের চুলা থেকে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে ১৯টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ০২(দুই) বান্ডিল ঢেউটিন ও গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি বাবদ = ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত টিন দিয়ে বর্তমানে তারা আবার নতুন ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছে। সরকারের পক্ষ হতে সকল ধরনের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা অব্যাহত আছে মর্মে তাদের সকলকে অবহিত করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে সহযোগিতা

অভিযোগ নং-রা.২৪/২৩

অভিযোগকারী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি বর্তমানে নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোরে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। তার বাবার চাকরিরত কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে তার বাবা-মা নওগাঁয় বসবাস করছে। তাই নাটোরে তিনি মেয়েদের মেসে থেকে লেখাপড়া করছেন। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নাটোরে থেকে লেখাপড়া করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায়, তিনি নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্রের মাধ্যমে নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। কিন্তু নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে অসহযোগিতা করছে। এ অবস্থায়, ভর্তি কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীকে পরিবার ছেড়ে নাটোরে একা থাকতে হচ্ছে যা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি মর্মে প্রতীয়মান। তাছাড়া অভিযোগকারীর পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল না থাকায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায়, মানবিকভাবে বিবেচনায় অভিযোগকারীকে নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, নওগাঁ-কে বলা হলে ০৯/০৭/২০২৩ তারিখের একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত) এর ২০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁয় ভর্তি করানো হয়েছে মর্মে প্রধান শিক্ষক, নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ জানিয়েছে।

গণপরিবহনে হয়রানি বন্ধে কমিশনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.২২/২২

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'ঢাকা শহরে গণপরিবহনে হয়রানি: কিশোরী এবং তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব' প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনে চলাচল করা কিশোরী-তরুণী ও নারীদের ৬৩ শতাংশ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশ যৌন হয়রানির শিকার হয়। যৌন হয়রানির শিকার এই নারীদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক (৪৫ শতাংশ) পরবর্তী সময়ে মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। উল্লেখ্য নারীর চলাচল নিরাপদ করার লক্ষ্যে গণপরিবহনে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য পরিবহন মালিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিতে গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর কমিশন থেকে একটি ডিও পত্র প্রদান করা হলে তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি কে নির্দেশ দিয়ে কমিশনে তার অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয় যে, "কেউ যৌন হয়রানির শিকার হলে তাৎক্ষণিক '৯৯৯' বা '১০৯' জরুরি সেবা নাম্বারে ফোন করে অভিযোগ করুন" বার্তাটি প্রতিটি বিআরটিসি'র বাসে দৃশ্যমান স্থানে স্টিকার লাগানো রয়েছে। গণপরিবহনে আসনের বেশি যাত্রী না তোলার জন্য সংশ্লিষ্টদের'কে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ডিপোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া গণপরিবহনে পরিচালিত বিআরটিসি'র বাসে যাত্রীসাধারণের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ওয়াই-ফাই সংযোগসহ গাড়ির অবস্থান ও গতিবিধি জানার জন্য VTS (Vehicle Tracking System) সংযোজিত রয়েছে। তাছাড়া গণপরিবহন হিসেবে পরিচালিত বিআরটিসি'র বাসে সিসি ক্যামেরা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। নারীদের জন্য বিআরটিসি বাস দিয়ে "মহিলা বাস সার্ভিস" চালু রয়েছে, তাতে কর্মজীবী মহিলাসহ নারী যাত্রীগণ নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জমি ফেরত পেলেন

অভি:যা:বা: নং-ঢা.১৮৭/২২

একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ হতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, গ্রামে তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে ঘর তৈরি করতে চাইলে তার চাচা সম্পত্তি দিচ্ছেন না। অভিযোগকারীর অসহায়ত্বের সুযোগে প্রতিপক্ষ জমি দখল করে নিয়েছে। অভিযোগকারী জমির দখল ফেরত চাইলে প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিচ্ছে। এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষ চাচার নিকট থেকে পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করে তাকে বুঝিয়ে দিতে অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন। অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ-কে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। উভয় পক্ষকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার নোটিশ দেওয়া হলে প্রতিপক্ষ একটি লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করেন। অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করেন যে, তার বাবার মোট স্থাবর সম্পত্তি ৬.৫০ শতাংশ যার ওয়ারিশদার মাসহ মোট নয় জন। অভিযোগকারী উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্য অংশে ঘর উঠালে তার কোনো আপত্তি থাকবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অভিযোগকারীর সাথে মুঠোফোনে আলাপকালে জানা যায়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সার্ভেয়ার দিয়ে জমি মেপে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত জমিতে ঘর নির্মাণ করবেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, অভিযোগের বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

বিনা পয়সায় এক প্রবাসীর মৃতদেহ দেশে ফেরত

অভি. যা. বা. নং ঢা- ৮৬/২৩

মানিকগঞ্জের একজন অভিযোগকারী জানান তার চাচা বৈধভাবে এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরবে যান। ১৫০০ রিয়ালের বিনিময়ে কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও প্রথম চার মাসে কোনো কাজই পাননি। এরপর তিনি কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যান এবং বাবুর্চির কাজ পান। সেখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তার লাশ সরকারি খরচে দেশে আনার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করলেও তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর অভিযোগকারী কমিশনে অভিযোগ করেন যে তার চাচার মৃতদেহ আনতে ৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কমিশন উক্ত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জানায়। এ বিষয়ে ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সৌদি আরবে মৃত প্রবাসীর মৃতদেহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের খরচে দেশে ফেরত আনার অনুমোদন রয়েছে। এছাড়া, ভুক্তভোগীর স্ত্রীর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, গত ২১/০৬/২০২৩ তারিখ সরকারি খরচে মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে।

কৃষি জমিতে হোটেল বর্জ্য ছড়ানো বন্ধকরণ

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.৪০/২৩

গত ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে 'কৃষি জমিতে হোটেল বর্জ্য, উর্বরতা নষ্টের আশঙ্কা কৃষকের' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে হোটেল-রেস্তোরাঁর বর্জ্য ফসলি জমিতে ফেলার অভিযোগ ওঠে। এতে জমির উর্বরতা নষ্ট ও বর্জ্যের পঁচা গন্ধে দুর্ভোগে পড়ছেন এলাকাবাসী ও পথচারীরা। স্থানীয়রা বিষয়টি একাধিকবার হোটেল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও তারা ময়লা ফেলা বন্ধ করেনি। অভিযোগের বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে প্রতিবেদন আকারে অবহিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এ প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত হোটেল মালিককে পঁচনশীল বর্জ্য বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে এবং অপঁচনশীল বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করে অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। যথাসময়ে নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক, মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কর্তৃক শুনানি শেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ১ (এক) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শিকলমুক্তকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

অভিযোগ নং ঢা- ১৯২/২৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক কমিশনে অভিযোগ করেন যে টাঙ্গাইল জেলার একজন মানসিক প্রতিবন্ধী যে একসময় মেধাবী ছাত্র ছিল সে গত ১৫ বছর ধরে শিকলবন্দী জীবনযাপন করছে। কমিশন বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়কে অবহিত করে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভুক্তভোগীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ভুক্তভোগীকে শিকলমুক্ত করা হয় এবং তাকে শিকলমুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে চলাচল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তার পিতাকে অনুরোধ করা হয়। ভুক্তভোগীর পিতা বয়স্ক ভাতা পান এবং সে প্রতিবন্ধী ভাতা পায়। পরিদর্শনের দিন উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে রোগী কল্যাণ সমিতি হতে ভুক্তভোগীর জন্য নগদ অর্থ এবং খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

কমিশনের উদ্যোগে বিদেশ থেকে ফিরলেন এক যুবক

অভিযোগ নং-ঢা.২০৭/২১

অভিযোগকারী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তার খালাতো ভাই ২০১৬ সালে কিছু টাকাসহ কেনাকাটা করার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এসবি অফিসের এক কর্মকর্তা এসে জানায় সে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের জাজপুর জেলে আছে। ২০১৬ সালে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে আটক হওয়ার পর তার ২ বছরের সাজা হয়। কিন্তু দুই বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও সে আজও মুক্তি পায়নি। এ অবস্থায় তাকে ভারতের জেল থেকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করে। এ বিষেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ হতে চাহিত প্রতিবেদন মতে, ভুক্তভোগীর প্রত্যাবাসন গত ১০ মে, ২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অভিযোগ নং ৩০৪/১৬

লক্ষ্মীপুরের একটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলার সময় জনৈক শিক্ষক এক শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে তার কান ধরে বেঞ্চ থেকে উঠিয়ে আনেন এবং পরীক্ষার হলে সব শিক্ষার্থীর সামনে তার বুকে লাথি মারেন ও স্কেল দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। উক্ত শিক্ষক শিশুটিকে আহত অবস্থায় স্কুল কক্ষে বসিয়ে রাখেন। পরে অভিভাবকরা খবর পেয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারি শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গ্রহণর্পূবক গৃহীত পদক্ষপে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য বলা হয়। তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি

অভিযোগ নং- চ.৪৫/২২

রাঙামাটিতে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুদে টাকা ধার দেয়া এবং চক্রবৃদ্ধি হারে প্রাপ্ত সুদ পরিশোধ করতে না পারলে মামলা দিয়ে হয়রানির বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায়। টাকা ধার দেবার সময় প্রতিপক্ষ তাদের কাছ থেকে খালি স্টাম্প এবং চেক বইয়ে স্বাক্ষর নিয়ে রাখে। প্রতিপক্ষ ব্যক্তিসহ আরো অন্যান্যকে এভাবে হয়রানি করছে। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাকে বলা হয়। উক্ত প্রধান শিক্ষক এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিভাগীয় মামলার রায়ে উক্ত শিক্ষকের ০১ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ০২ বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

বেআইনিভাবে তল্লাশির কারণে পুলিশের শাস্তি

অভিযোগ নং- ৫৪/১৮

হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থানার ওসি অভিযোগকারীর বাড়িতে বেআইনিভাবে তল্লাশি করে এবং বাড়িতে অবস্থানরত মহিলাদের সাথে অশোভন আচরণ করার অভিযোগ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগকে বলা হয়। জননিরাপত্তা বিভাগের নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। বিভাগীয় মামলার ফলাফল কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলে জননিরাপত্তা বিভাগের প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ধারা ৪(ক) (২) (খ) উপবিধি অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে তার ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বর্ধিত বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ভারতের কারাগার থেকে ১৮ জন জেলে উদ্ধার

অভিযোগ নং- সুয়োমটো ব. ০৪/২৩

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'ভারতের কারাগারে চরফ্যাশনে সিত্রাংয়ে নিখোঁজ ২০ জেলে; দ্রুত ফিরিয়ে আনার দাবি' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি কারাগারে ভোলার চরফ্যাশনে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ে ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ ২০ জেলের সন্ধান মিলেছে। নিখোঁজ জেলেদের নাম উল্লেখ রয়েছে। ঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ এবং পরবর্তীতে ভারতের কারাগারে আটকে থাকা এসব জেলের মানবাধিকার রক্ষার্থে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে: কমিশনে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কারণে ট্রলার ডুবে ভারতের উড়িষ্যায় উদ্ধার হওয়া ১৮ জন জেলের মধ্যে ১৫ জনের প্রত্যাবাসন গত ২৮/০৪/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ০৩ জনের প্রত্যাবাসন গত ১৩/০৭/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

নিষিদ্ধ ঔষধ উৎপাদন করায় লাইসেন্স বাতিল

অভিযোগ নং- খু. ৩৭/২২

এপিএস ল্যাবরেটরীজ (আয়ু.) নামীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবৈধ কেমিকেল ব্যবহার করে নিষিদ্ধ ঔষধ উৎপাদন করাসহ বিক্রয় প্রতিনিধিদের দ্বারা মাদকদ্রব্য বাজারজাত করা সংক্রান্ত এক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তপূর্বক কমিশনের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-কে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিদর্শক দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৫(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৫(২) ধারা মোতাবেক কেন এপিএস ল্যাবরেটরীজ (আয়ু.)-এর ঔষধ উৎপাদন লাইসেন্স সাময়িক বাতিল/বাতিল করা হবে না মর্মে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানো হয়েছে। পরবর্তীতে, নিষিদ্ধ ঔষধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ.পি.এস ল্যাবরেটরীজ (আয়ুর্বেদিক) এর ঔষধ উৎপাদন লাইসেন্সের অনুকূলে সকল ধরনের ঔষধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ স্থগিত করা হয়েছে।

গণনলকূপের অতিরিক্ত চার্জ হ্রাস

অভিযোগ নং- খু. ৮১/২২

যশোরে বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত একটি গণনলকূপের সুবিধাভোগী কৃষকদের নিকট থেকে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি ২-৩ বছর যাবৎ জোরপূর্বক উক্ত গণনলকূপটির পানি সেচে অতিরিক্ত টাকা নির্ধারণপূর্বক আদায় করে। অভিযোগের বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি-না, না হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেচ), জেলা বিএডিসি (সেচ) অফিস, যশোর-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি জ্ঞাতার্থে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বরাবর প্রেরণ করা হয়। বাদী ও বিবাদীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ৩০/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে স্কিমের হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লিখিত বিষয়ে অভিযোগকারীদের মধ্যে বর্তমানে কোন অসন্তোষ নাই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও, পরবর্তীতে উক্ত স্কিমের কমিটির ১২ জন সদস্য মিলে নতুন ম্যানেজার নির্ধারণসহ সেচ চার্জ নির্ধারণ করবেন মর্মেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিএডিসি'র পক্ষ হতে সেচ চার্জ কমানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়।

হেফাজতে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের অবহেলার শাস্তি

অভিযোগ নং- সুয়োমটো খু. ১৬/২১

একটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাতক্ষীরায় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, পরিবারের দাবি পিটিয়ে হত্যা' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাতক্ষীরা গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় মাদক মামলায় গ্রেফতার হওয়া একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় উক্ত ব্যক্তিকে গোয়েন্দা পুলিশের লোকজন পিটিয়ে হত্যা করে। তবে পুলিশের দাবি গোয়েন্দা পুলিশের লকআপের মধ্যে সে আত্মহত্যা করে। তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। প্রমাণিত হয় যে হেফাজতের দায়িত্বে থাকা দুজন পুলিশের উপর অর্পিত স্ব-স্ব দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে অবহেলা ও গাফিলতির কারণে এরূপ আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিভাগীয় মামলায় উভয়ের ১টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ২ বছরের জন্য স্থগিত করে" গত ০৭/০৪/২০২২ তারিখে পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয়।

সভা/সেমিনার

রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত গণশুনানী

রাঙামাটি জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

ফেনী জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

গোপালগঞ্জ জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

নাটোর জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা

পাবনার বেড়া উপজেলায় মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মানবাধিকার সুরক্ষায় গণমানুষের প্রত্যাশা: গণমাধ্যম ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সমন্বিত প্রয়াস শীর্ষক সেমিনার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা : নাগরিকের মানবাধিকার প্রেক্ষিত শীর্ষক কর্মশালা

কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং এডুকো আয়োজিত "প্রস্তাবিত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০২২" শীর্ষক আলোচনা সভা

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্ম অন্তর্ভুক্তকরণের অগ্রগতি ও আইনি বাস্তবতা শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা

নীলফামারীতে ২৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত "যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইনের খসড়া প্রস্তাবনাঃ সর্বশেষ অবস্থা ও করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

গত ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সকাল ১০ টায় রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে কমিশনের উদ্যোগে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। কমিশনের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা। কাতারের মানবাধিকার কমিটির পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ সাইফ আল কুয়ারি, ডেপুটি চেয়ারপারসন, জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতার এর মহাসচিব সুলতান আল জামালি, বাংলাদেশে নিযুক্ত কাতার দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স সাঈদ জারাল্লা আল- সামিখ, এবং উক্ত দূতাবাস ও কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির আওতায় দুই দেশের মানবাধিকার কমিশন/কমিটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আলোকে নিজ নিজ জাতীয় আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ, মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং যৌথ গবেষণা সম্পাদন, যৌথভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মিডিয়া কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যৌথভাবে সম্পাদন করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আনিসুল হক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষত প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাতার ও বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একযোগে কাজ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ নিজ নিজ দেশের মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আমি আশা করব, এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও কাতারের মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর দুই কমিশনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় কাতারের মানবাধিকার কমিটির সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-কে এ স্ট্যাটাস প্রাপ্তির বিষয়ে কাতারের মানবাধিকার কমিশন সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করে। কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির চেয়ারপারসন গ্লোবাল এলায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউশনস এর চেয়ারপারসন। কাজেই বাংলাদেশের কমিশনকে এ স্ট্যাটাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কাতারের মানবাধিকার কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলে, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণ যাতে মানবাধিকার সুরক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন সে লক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে 'মানবাধিকার সুরক্ষায় প্যানেল আইনহজীবীগণের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন, সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা। মাননীয় প্রধান বিচারপতি উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়েছিল ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, জাতীয় ৪ নেতার হত্যা এবং এই হত্যাকাণ্ডের খুনিদের বিচারের আওতায় না আনার জন্য ইনডেমনিটি অ্যাক্ট পাস করা। তিনি আরও বলেন, মৌলিক অধিকার আর মানবাধিকারের পার্থক্য রয়েছে। মৌলিক অধিকার একেক দেশে একেক রকম, কিন্তু, মানবাধিকার সারা বিশ্বে এক রকম। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে মানবাধিকারের ধারণা নানা মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। মানবাধিকার প্রয়োগ হয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে। এজন্য আইন বিভাগ আছে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে। আর বিচার বিভাগ আছে আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে। আর সেই আইন প্রযুক্ত হয় আইনজীবীদের কর্মকুশলতায়। মানবাধিকারের সঙ্গে তাই আইনজীবীদের সম্পর্ক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাঁদের জন্য আয়োজিত আজকের এই কর্মশালা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। মানবাধিকার কমিশনের প্যানেল আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিচার প্রার্থীদের পাশে দাঁড়ালে মনে রাখবেন আপনি মানবাধিকার কর্মী। নিজ পেশার প্রতি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ হোন। তিনি মানবাধিকার কমিশনকে হাজতে থাকলে হাজতবাসীদের জন্য খাবারের বাজেট আছে কিনা; দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাগারে যারা আছেন, পাবনা মানসিক হাসপাতালে মানসিক রোগী না হয়েও যারা আটক আছেন তাদের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ সবার মানবাধিকার আছে। অতিরিক্ত বল প্রয়োগ আন্দোলনকারী পুলিশ কারোরই উচিত নয়। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে কোনদিন মানুষ একটি সুন্দর সমাজ পাবেনা।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "মানবাধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সুসংহত করণের লক্ষ্যে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদানে কমিশন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় প্যানেল আইনজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে মর্মে

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। অসহায়, নিপীড়িত মানুষ যেমন নিগৃহীত নারী, অসহায় মা আইনের দুয়ারে গিয়ে কাজ করতে পারেনা। তাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্যানেল আইনজীবীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা, দায়বদ্ধতা ও সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তিনি আরও বলেন, কমিশন সরকারি নয়। স্বাধীনভাবে কাজ করে। গণমাধ্যমের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন গৃহীত খবর প্রচার করার আহবান জানান। এতে জানলে মানুষ জানবে প্রতিকার পাবে।

উদ্বোধনী পর্বের পর প্যানেল আইনজীবীগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় করণীয় সংক্রান্ত দুটি ওয়ার্কিং সেশন মডারেট করেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মোঃ আশরাফুল আলম। সমাপনী সেশনে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ

গত ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ সকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে সদস্যগণ। সাক্ষাৎকালে নবনিযুক্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তাঁরা। কমিশনের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে বর্তমান কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, বর্তমান কমিশন ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ আলোকে ম্যান্ডেট অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি কমিশনের কার্যক্রমের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা দৃশ্যমান হচ্ছে এবং এভাবেই মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশনকে কার্যক্রম আরও জোরদারভাবে চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। কারাগারে বিনা বিচারে দীর্ঘ সময় আটক থাকা ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা এবং বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তিতে কমিশনকে আরও জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান তিনি। এ সময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা, অবৈতনিক সদস্য জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ড. তানিয়া হক, পরিচালক (তদন্ত ও অভিযোগ), উপপরিচালক জনাব গাজী সালাউদ্দীন, জনাব আজহার হোসেন এবং জনাব ফারহানা সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ স্থানীয় প্রশাসন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন যৌথভাবে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করেছে। গ্রামগুলো হলো রুদ্রপুর, ভাবকি, নালিখালী, ঈশ্বরগ্রাম, মিরপুর, হাতিল, আমোদপুর, ঝনকা ও সত্রাশিয়া। মুক্তাগাছায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এ ঘোষণা দেয়া হয়। আড়ম্বরপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মুক্তাগাছা উপজেলার ০৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: সেলিম রেজা, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মো: মোস্তাফিজার রহমান, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ, ডা: মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ, আলহাজ্ব মো: বিল্লাল হোসেন, মেয়র, মুক্তাগাছা পৌরসভা, মো: আব্দুল মজিদ, অফিসার ইনচার্জ, মুক্তাগাছা থানা এবং সঞ্জয় মন্ডল, সিনিয়র ম্যানেজার, অ্যাডভোকেসি অ্যাণ্ড জাস্টিস ফর চিল্ড্রেন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুক্তাগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কে এম লুৎফর রহমান ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (এসডিজি) অনুসরণ করে শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, বাল্যবিবাহ নিরসনে ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাথে স্বাক্ষরিত এক সমঝোতা স্মারকের অধীনে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৯টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি, উঠান বৈঠক, সভা, কর্মশালা, ক্যাম্পেইন, নাটক প্রদর্শনসহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। এর ফলে উক্ত ০৯টি গ্রামে গত এক বছরে কোনো বাল্যবিয়ে হয়নি।

ভবিষ্যতেও যাতে অত্র উপজেলার উক্ত ০৯ টি গ্রামসহ অন্যান্য ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ সংঘটিত না হয় তার জন্য শিশু ফোরাম, যুব ফোরাম, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এলাকাগুলোতে উপজেলা প্রশাসন, থানা ও উপজেলায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে যৌথভাবে বাল্যবিবাহ রোধে সব ধরনের কার্যক্রম চলমান রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচারাভিযান

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ময়মনসিংহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচারাভিযানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এ সময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অভিযানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান।

শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

গত ১ জুন ২০২৩ তারিখ শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধ করতে এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত দেশ গড়তে শিশু কল্যাণে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

দেশজুড়ে ব্যাপক সংঘাতে নির্বিচারে পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মী ও জনসাধারণকে আক্রমণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে রাজধানীতে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। দেশজুড়ে ব্যাপক সংঘাতে নির্বিচারে পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মী ও জনসাধারণকে আক্রমণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সভা সমাবেশ করবে, একে অপরকে বিভিন্ন ইস্যুতে গঠনমূলক সমালোচনা করবে এটাই প্রত্যাশিত। তবে সভা-সমাবেশের নামে জনগণের জান-মালের ওপর আক্রমণ,

অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনা চরম নিন্দনীয় যার নিন্দা ও সমালোচনা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই। বিশেষত, ফকিরাপুলে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুর্বৃত্তরা একজন পুলিশ সদস্যকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায়না। এছাড়াও বিভিন্ন গণপরিবহন, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় হতাহতের সংবাদ, জনসাধারণকে নির্বিচারে আক্রমণ, পুলিশ ও গণমাধ্যম কর্মীদের বেধড়ক পেটানোর বিবিধ তথ্য কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ অবস্থায় জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। সৃষ্ট সহিংস রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চার বদলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। কমিশন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার আহবান জানায়। জনসাধারণের অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সহিংসতামুক্ত চলাফেরার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত-পূর্বক যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রকার নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হয় জনগণ। সকল রাজনৈতিক দলকে জনমুখী, সহনশীল এবং সংঘাতমুক্ত রাজনৈতিক চর্চার আহবান জানান তিনি।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যৌথ অ্যাডভোকেসি এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ ও আর্টিকেল নাইনটিন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ কমিশনের কার্যালয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যৌথ অ্যাডভোকেসি এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ ও আর্টিকেল নাইনটিন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, সচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক, আর্টিকেল নাইনটিন এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রুমকী ফারহানা, প্রতিষ্ঠান দুটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের সাংবাদিকরা।

ফিলিস্তিনে মানবিক বিপর্যয় দ্রুততার সাথে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান

বর্তমান ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুততার সাথে সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, সংঘাতে নারী ও শিশুসহ নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর নির্বিচারে নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্টভাবেই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে সশস্ত্র সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার যে নিয়ম আছে তার লঙ্ঘন হচ্ছে স্পষ্টতই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কালক্ষেপণ না করে যুদ্ধের অবসান ও নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষে অবস্থান নিতে আহবান জানিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

যেকোনো যুদ্ধ ও সংঘাতে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ঘটে। সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে যুদ্ধবিরতি। প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিই করছে। এজন্য দ্রুত কার্যকর শান্তি আলোচনা ও পদক্ষেপ বিশেষভাবে প্রয়োজন। পাশাপাশি স্থায়ীভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্যনির্ভর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংঘাতের মূল কারণ জিইয়ে রেখে শান্তি প্রচেষ্টার কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখবে না।

কমিশন মনে করে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার ফিলিস্তিনের নিরপরাধ জনসাধারণ। সুদীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে অধিকার আদায়ের জন্য ফিলিস্তিনের জনগণ সংগ্রাম করে আসছে। ফিলিস্তিনের জনগণ এই সংঘাতের কারণে অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে অধিক সোচ্চার হওয়ার আহবান জানায় কমিশন।

‘থানায় নিয়ে ওসির কক্ষে এডিসির নেতৃত্বে মারধর’ শীর্ষক ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে ‘থানায় নিয়ে ওসির কক্ষে এডিসির নেতৃত্বে মারধর’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদসহ একই বিষয়ে অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদন মতে, রাজধানীর শাহবাগ থানার ওসির (তদন্ত) কক্ষে গত ০৯/০৯/২০২৩ তারিখ শনিবার রাতে পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) হারুন অর রশিদের নেতৃত্ব ছাত্রলীগের দুই কেন্দ্রীয় নেতাকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। এমনকি, আরেকজন কেন্দ্রীয় নেতা তাদের খোঁজ নিতে গেলে তাকেও মারধর করা হয়েছে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের অন্য নেতা-কর্মীরা গিয়ে থানা থেকে উক্ত নেতাদের উদ্ধার করেন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ণিত সংবাদ প্রতিবেদনে একজন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যক্তিগত আক্রোশকে কেন্দ্র করে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক মানবাধিকার লঙ্ঘন করার চিত্র ফুটে উঠেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন পুলিশ কর্মকর্তার এহেন আচরণ আইন ও নীতি বিরুদ্ধ। কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, কমিশন মনে করে তদন্ত সাপেক্ষে ঘটনায় জড়িত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। এ অবস্থায়, অভিযোগের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে।

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং কমিশন কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময়

গত ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: সেলিম রেজা শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের সাথে শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পূজার পুরো সময় জুড়ে আমরা সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ও সহিংসতা প্রতিরোধে আমরা সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে যোগাযোগ রেখেছি। পাশাপাশি নির্বাচনকালীন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যাতে কোনোপ্রকার সহিংসতার শিকার না হয় সেজন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সোচ্চার রয়েছে'।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: সেলিম রেজা এবং প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পূজামণ্ডপ এলাকার বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি উপস্থাপন

"আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অত্যন্ত সচেতন। এ বিষয়টিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিবিড়ভাবে কাজ করছে। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যাতে না ঘটে এবং সকল ধর্মের জনগণ যাতে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে সোচ্চার থাকবে কমিশন। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে"।

গত ১২/১০/২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৭ সদস্যের প্রতিনিধি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাতে আসলে তাঁদের সাথে আলোচনাকালে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এড. রাণা দাশগুপ্ত এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। এতে, নির্বাচনকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘন মনিটর করার জন্য কমিশন কর্তৃক একটি মনিটরিং সেল গঠন; ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু নির্বাচনী এলাকাগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে এতে বিশেষ নজরদারী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান; নির্বাচন পূর্বাপর সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশন কর্তৃক তদন্ত করা; স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ ৫ দফা প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মানিত সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা বিচার ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সামিল মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার এক পর্যায়ে কাকরাইল মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীগণ মাননীয় প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসবভবন এবং নিকটবর্তী বিচারপতি ভবনে সন্ত্রাসী হামলা ও ভাংচুর করে। এ ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আক্রমণ মানে বিচার ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সামিল মর্মে মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও ন্যাক্কারজনক। এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ যারা করেছে, তাদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে বলে আমি মনে করি"।

তিনি আরও বলেন, 'একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সভা সমাবেশ করবে, একে অপরকে বিভিন্ন ইস্যুতে গঠনমূলক সমালোচনা করবে এটাই প্রত্যাশিত। তবে সভা-সমাবেশের নামে জনগণের জান-মালের ওপর আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনা চরম নিন্দনীয় যার নিন্দা ও সমালোচনা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই। সহিংসতার এক পর্যায়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আক্রমণ করে যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায়না। এ আক্রমণ সার্বিক বিচার ব্যবস্থার প্রতি হুমকি এবং কমিশন এতে গভীর নিন্দা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছে।'

বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা প্রয়োজন মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সম্প্রতি শ্রমিক আন্দোলনের ফলে গাজীপুর আশুলিয়া ও মিরপুরে সাড়ে চারশ' পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা করার ঘটনার প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, এর ফলে ৪০ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে যেতে পারে, যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এর ফলে মালিকপক্ষ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবে তেমনি অন্যদিকে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তীব্র সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং মালিকদের সামর্থ্য ইত্যাদি সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একথা স্মরণে রাখা উচিত এই খাত দেশের অর্থনীতির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমন আমাদের মালিক ও শ্রমিক সবার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতকে সব ধরনের বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে সম্মিলিতভাবে চলমান সংকট মোকাবিলা করার আহ্বান জানান তিনি।

উড়ালসড়ক থেকে রড পড়ে শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় মামলা

সুয়োমটো ঢা.২৯/২৩

গত ২৯ মে ২০২৩ তারিখ একটি দৈনিক পত্রিকায় "মহাখালীতে উড়ালসড়ক থেকে পড়া রড মাথায় ঢুকে প্রাণ গেল শিশুর" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাজধানীর মহাখালী উড়ালসড়কের ওপর থেকে পড়া রড মাথায় ঢুকে ১২ বছর বয়সী এক শিশু মারা যায়। এভাবে রড পড়ে মৃত্যুর ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের অবহেলার নামান্তর। এই ঘটনা আরো বৃহৎ জনবিপর্যয় ঘটাতে পারতো। যার দায় কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব নয় মর্মে কমিশন মনে করে। প্রতিবেদন আকারে কমিশনকে অবহিত করতে সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-কে বলা হলে জানা যায় যে, অভিযুক্ত নির্মাণ শ্রমিক চুরির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে রডটি নিচে ফেলে যা নিচে অবস্থানরত কিশোরের মাথায় আঘাত করে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবেদন দাখিলের আহবান

সুয়োমটো ঢা.৩৩/২৩

গত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় 'ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। রাজধানীর তুরাগের বাউনিয়ায় ৫ জুন ২০২৩ তারিখ রাতে বাড়ির দোতলা থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন আসামি ওই নারীর স্বামী। পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ির দারোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। এরপর ১০ দিন তার কোনো খোঁজ পায়নি তার পরিবার। স্বজনদের অভিযোগ, ডিবি হেফাজতে নির্যাতনের কারণে আলাল মারাত্মক আহত হন এবং পরে মারা গেছেন। সংবিধান অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে আটক করার পর তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ভুক্তভোগী আলাল উদ্দিন আটক হওয়ার পর ১০ দিন নিখোঁজ ছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে

তার মৃত্যু হয়েছে, যা রহস্যের জন্ম দেয়। হেফাজতে থাকাকালীন একজন ব্যক্তির এভাবে মৃত্যুর ঘটনা মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, ভিকটিমের মৃত্যুর ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

শ্রমিকনেতা হত্যার ঘটনায় কমিশনের উদ্যোগ

সুয়োমটো ঢা.৩৫/২৩

গত ৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় "শ্রমিকনেতা শহিদুল হত্যা: মালিকপক্ষের 'ভাড়াটে হয়ে' হামলা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা আদায়ে আরও দুই শ্রমিকনেতাকে নিয়ে গাজীপুরের টঙ্গীর প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেডে গিয়েছিলেন শহিদুল ইসলাম। মালিকপক্ষের সঙ্গে বসলেও বিষয়টির সুরাহা না হওয়ায় পরদিন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মালিকপক্ষ। কারখানা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরেই তাঁদের ওপর হামলা করা হয়, যাতে প্রাণ হারান শহিদুল। শ্রমিকদের বেতন ভাতা আদায় করতে গিয়ে এভাবে একজন শ্রমিক নেতার মৃত্যু কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিষয়টি মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এ ঘটনায় টঙ্গী পশ্চিম থানায় মামলা হলেও এখনও সম্ভাব্য সকল আসামী গ্রেফতার হচ্ছে না যা সমীচীন নয়। এ অবস্থায়, এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-২, গাজীপুর-কে বলা হয়েছে।

পুলিশের চাঁদাবাজি বন্ধের পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.৩৭/২৩

গত ১৫ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় 'টাকা দিয়ে থানা থেকে মেয়ের লাশ নিলেন বাবা' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গত ১৪ জুলাই, ২০২৩ দুপুরে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের ভিআইপি প্লাজায় সংবাদ সম্মেলন করে এক মহিলা ভৈরব থানার এক উপপরিদর্শকের বিরুদ্ধে লাশ হস্তান্তরের বিনিময়ে ২০ (বিশ) হাজার টাকা গ্রহণের অভিযোগ গত ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ কালীপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী নয়াহাটি গ্রামের একটি নির্জন জায়গা থেকে উক্ত মহিলার কন্যার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেন ঐ এসআই। রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের লাশ বাড়িতে নিয়ে দাফন করেন ভুক্তভোগীর বাবা। এ ঘটনায় গত ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ ঘটনার দিনও উক্ত এসআই নিহতের বাবাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল, ভয় দেখানো এবং এক জনপ্রতিনিধির মুঠোফোন ছুড়ে ফেলেন বলে জানায় ভুক্তভোগীর পরিবার। অভিযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

সাংবাদিক হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের

সুয়োমটো ঢা. ১৫/২৩

একটি গণমাধ্যমে 'যুগান্তরের ধামরাই প্রতিনিধির ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা' শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। যুগান্তরের ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি শামীম খানের ওপর হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। তারা শামীমের হাত-পা ভেঙে দেয়। এরপর তাকে অচেতন অবস্থায় সাটুরিয়া উপজেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উপজেলার গাংগুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারি ও একাধিক দুর্নীতির সংবাদ যুগান্তর পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এতে সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কাদের মোল্লা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী। তারা শামীম খানকে মাঝে মধ্যেই প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিল। এরই জেরে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ অবস্থায়, যুগান্তরের ধামরাই প্রতিনিধির উপর হামলার ঘটনাটি তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ সুপার, ঢাকা-কে বলা হয়। এরপর পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে।

যাত্রাবাড়ির ধলপুরে তেলেগুদের বাসস্থান পরিদর্শন

তেলেগুদের বাসস্থানের ব্যবস্থা

সুয়োমটো ঢা.১৩/২৩

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে "ধলপুরে তেলেগুদের উচ্ছেদের নির্দেশ" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কোনো ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুরের তেলেগু কলোনির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাতব্বরদের থানায় ডেকে হুমকি দিয়ে বিনা প্রতিবাদে কলোনি ছাড়তে বলেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে ৮/৯টি গাড়ি পুলিশ নিয়ে কলোনিতে ভাঙচুর চালানো হয়। বিকল্প হিসেবে যে জায়গায় তাদের যেতে বলা হয় সেটিও বেদখলি জমি। বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুরের সময় দেওয়াল চাপায় দুজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহে ১৯৯১ সাল থেকে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিক ধলপুরের তেলেগু সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের কলোনি থেকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া উৎখাতের বিষয়টি নিতান্তই অমানবিক ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে বিবেচনা করে এ বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ অবস্থায়, ধলপুরে বসবাসরত তেলেগু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উচ্ছেদের আতঙ্ক হতে অব্যহতি দানপূর্বক পরিকল্পিত উপায়ে আবাসনের সংস্থান করে কমিশনকে অবহিত করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা-কে বলা হলে জানা যায়, তেলেগু সম্প্রদায়ের ঐ সকল বাসিন্দারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও এবং অবৈধভাবে বসবাস করলেও মানবিক দিক বিবেচনায় তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ২৫টি তেলেগু সম্প্রদায়ের পরিবারকে সম্পূর্ণ নতুন কোয়ার্টার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তেলেগু জনগণের পুনর্বাসনের জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বান্দরবানের লামা উপজেলায় ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিদর্শন

সাংবাদিক হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে ডিএমপিকে অবহিতকরণ

সুয়োমটো ঢা.০৯/২৩

একটি পত্রিকায় "কারওয়ান বাজারে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা" শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় মাদক কারবারিরা। হামলাকারীরা টেলিভিশনের গাড়ি ও ক্যামেরা ভাঙচুর করে। পরে র‍্যাব ও পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে গ্রেফতার করে। গণমাধ্যম হচ্ছে সমাজের দর্পণ। এ দেশে মুক্ত সাংবাদিকতাকে সচল রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণসহ হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা-কে বলা হয়েছে।

র‍্যাবের গুলিতে নিহত বৃদ্ধের ঘটনায় তদন্ত

সুয়োমটো ঢা.২০/২৩

একটি পত্রিকায় " নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' ৬৫ বছরের বৃদ্ধ নিহত" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' ষাটোর্ধ্ব একজন বৃদ্ধ নিহত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আরেক ব্যক্তি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, রাতে গ্রামে ডাকাত পড়েছে শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে সাদা পোশাকে র‍্যাব সদস্যরা তাদের গুলি করে। সোনারগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আহসান উল্ল্যাহ বলেন, 'নিহতের পেটে গুলির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গভীর রাতে আসামী ধরতে গিয়ে র‍্যাবের গুলিতে একজন ব্যক্তি নিহত ও অন্য একজন গুরুত্বর আহত হওয়ার ঘটনাটি অনভিপ্রেত এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়টি তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

ভুয়া ভ্যাকসিন বিক্রি বন্ধকরণে পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.২২/২৩

গত ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে বিভিন্ন গণমাধ্যমে "ছয় হাজার নারীকে জরায়ু ক্যান্সারের ভুয়া ভ্যাকসিন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ঢাকা, গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন বা টিকার নামে আমদানি নিষিদ্ধ হেপাটাইটিস-বি'র টিকা দিয়ে প্রায় ছয় হাজার নারীর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। গত দুই বছরে এই প্রতারকচক্র ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী নারীদের কাছে টিকা বিক্রি করে প্রায় চার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ভুয়া টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় কয়েকজন টিকা গ্রহীতার শারীরিক ক্ষতি হয়েছে। এ অবস্থায়, প্রতারণামূলক টিকা ক্যাম্পেইন বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়। এরপর অভিযোগের বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি সকল জেলা কার্যালয়ে ভ্যাক্সিনেশন সেন্টারের তালিকা প্রস্তুত এবং এ সকল ভ্যাক্সিনেশন সেন্টারসহ ভ্যাকসিন সংরক্ষণ, বিতরণ, বিক্রয়কারীদের নিয়মিতভাবে পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ এবং নকল ভ্যাকসিন সনাক্ত/বন্ধকরণের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। একই সাথে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ছাড়া ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম স্কুল কলেজে না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনায় গৃহীত পদক্ষেপ

সুয়োমটো ঢা.৩৯/২৩

গত ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় 'হিরো আলমের ওপর হামলায় চারজন গ্রেপ্তার' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ঢাকার গুলশান, বনানী ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনের ভোট চলাকালে বেলা সোয়া তিনটার দিকে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে হামলার শিকার হন সংসদ সদস্য প্রার্থী জনাব আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলম। ভোট চলাকালে হিরো আলমের ওপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। একইসাথে ঘটনাটি নির্বাচনী আচরণ-বিধির পরিপন্থি ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ অবস্থায়, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগে বর্ণিত ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশন-কে অবহিত করার জন্য পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা-কে বলা হয়েছে।

পুলিশের হাতে নির্যাতন ও মুক্তিপণ

সুয়োমটো ঢা.৪১/২৩

গত ১৯ জুলাই, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে "2 cops tortured three people to extort money" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সাভারের আশুলিয়ায় পৃথক তিনটি ঘটনায় ৩ জনকে নির্যাতন ও তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এছাড়া, এই ৩ জনের একজন তার মেয়েকে পুলিশের কথামতো তাদের হাতে তুলে না দেওয়ায় তাকে নির্যাতন এবং ৮০ হাজার টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। এই ২ পুলিশ কর্মকর্তা অপর একজনকে আটক করেন এবং প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে নির্যাতন করেন। পরে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেন। তার পরিবার পুলিশকে ৭৪ হাজার টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভুক্তভোগী তিনজন পৃথক ব্যক্তির বরাত দিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। আনীত অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি হওয়া আবশ্যক মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, উল্লিখিত অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া গতিশীল করার জন্য কমিশনের উদ্যোগ

সুয়োমটো ঢা.৫২/২৩

০৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন 'শর্তের জালে আটকে আছে ৭৬২১ নারীর মাতৃত্ব' -এর প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকার ১ হাজার ৮০টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সাড়ে ৩ বছরের বেশি সময় ধরে আটকে আছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হলেও চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। সাড়ে তিন বছরেও একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না করতে পারার বিষয়টি যেমন অগ্রহণযোগ্য তেমনি পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকার মতো একটি বেসামরিক পদে অন্তঃসত্ত্বা নয় মর্মে সনদ জমার শর্তও অমানবিক। কমিশন মনে করে, সংবাদ প্রতিবেদনে বর্ণিত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা এবং অমানবিক শর্ত মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়টি যাচাই করে কমিশনে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর-কে বলা হয়েছে।

গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে মিডিয়ায় ব্রিফ করছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

বিস্ফোরণে আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য

ভুক্তভোগীকে আইনজীবী দ্বারা সহযোগিতা প্রদান

সুয়োমটো চ.০৩/২৩

গত ১১/০১/২০২৩ তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'মারধরের শিকার রোগী ও স্বজনদের বিরুদ্ধে মামলা দিল পুলিশ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিডনি ডায়ালাইসিসের ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে মঙ্গলবার (১০ই জানুয়ারি, ২০২৩) দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফটকের সামনে সড়ক অবরোধ করেন রোগী ও স্বজনেরা। এক পর্যায়ে পুলিশ তাঁদের কয়েকজনকে মারধর করে সেখান থেকে উঠিয়ে দেয়। মানুষের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উক্ত ডায়ালাইসিসের খরচ বৃদ্ধি না করে কিভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। মোস্তাকিমের বিষয়টি মানবিক প্রতীয়মান হওয়ায় আলোচ্য মামলা পরিচালনার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে একজন আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবী জনাব শুভাশিষ শর্মা কমিশনকে অবহিত করেন যে জনাব মোস্তাকিম বিজ্ঞ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন।

বানভাসী মানুষের পাশে কমিশন

সুয়োমটো চ. ১৯/২৩

একটি ফেসবুক পেজের একটি পোস্টে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত পোস্টে একজন ব্যক্তি দুই দিন যাবত বাড়ির চারপাশে পানির কারণে তার তিনটি ছোট বাচ্চা নিয়ে বাড়ির ছাদে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। বিগত কিছুদিনের ভারী বৃষ্টি জনিত জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগের সময়ে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের মানবিক ও সহায়ক ভূমিকা জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো পানিবন্দী মানুষের সকলের নিকট ত্রাণ কর্মীরা এখনো পৌঁছাতে পারেননি। এমনি একটি অসহায় অবস্থান ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ভুক্তভোগী এবং তার সাথে থাকা শিশুদের দ্রুততার সাথে উদ্ধারসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম-কে বলা হয়। এ বিষয়ে গত ১৩/০৮/২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চট্টগ্রামের সাথে কথা বলে জানা যায়, ভিকটিম ও তার সন্তানদের উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা বর্তমানে নিরাপদে নিজেদের বাড়িতে অবস্থান করছেন।

হাসপাতালে শয্যা নিয়ে বুয়াদের বাণিজ্য রোধ

অভিযোগ নং- সুয়ো. ব. ০৩/২৩

গত ০৯/০১/২০২৩ তারিখ পত্রিকায় প্রকাশিত 'শয্যা নিয়ে বুয়াদের বাণিজ্য চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট' শীর্ষক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে একজন প্রতিবেদক সরেজমিনে গিয়ে শয্যা ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকটসহ নানা অব্যবস্থাপনার বিষয়ে ভুক্তভোগী, সেবাপ্রার্থী ও সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য প্রতিবেদনে বিবৃত করেন। হাসপাতালে বুয়া নামধারীদের বাণিজ্য কিংবা চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা এবং বিভিন্ন রকম অব্যবস্থাপনার চিত্র প্রায়শই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষের সুচিকিৎসা প্রাপ্তির মত মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষিত হতে পারে মর্মে কমিশন মনে করে।

এ অবস্থায়, প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে।

যশোর মেডিকেলে টর্চার সেল বন্ধের পদক্ষেপ

অভিযোগ নং- সুয়ো. খু. ০৭/২৩

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'যশোর মেডিকেল কলেজে অঘোষিত টর্চার সেল' সংক্রান্ত সংবাদ মারফত জানা যায় যে, যশোর মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে কতিপয় অছাত্রের নির্যাতনে কয়েকজন শিক্ষার্থী পড়ালেখা বাদ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। যাদের নির্যাতনে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে তারা এখনো বহাল তবিয়তে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কলেজ হোস্টেলে কেবল মাদক সেবন করা হয় না; সেখানে তৈরি করা হয়েছে টর্চার সেল। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের ধরে নিয়ে হোস্টেলের ১০৪ নম্বর রুমে মারপিট করা হয় বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ওই রুমে এর আগেও অনেক শিক্ষার্থীকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। উক্ত সংবাদ গোচরীভূত হওয়ার সাথে সাথে সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ করে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

জামালপুরে হত্যাকাণ্ডের শিকার সাংবাদিক গোলাম রব্বানীর বাড়িতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

পল্লী চিকিৎসককে তুলে নিয়ে যাওয়া মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন

অভিযোগ নং- সুয়োমটো. খু-০৮/২৩

গত ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় প্রকাশিত 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিচয়ে পল্লী চিকিৎসককে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে যশোর শহরের খড়কি এলাকা থেকে এক পল্লী চিকিৎসককে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা যে পরিচয়েই একজন নাগরিককে তুলে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, নিখোঁজ ঐ ব্যক্তিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করে স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। উল্লিখিত ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে জরুরি ভিত্তিতে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান এবং এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন। নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা-কে বলা হয়।

নারী ফুটবলারদের মারধরের ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

অভিযোগ নং-সুয়োমটো খু. ১২/২৩

গত ০২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ অনলাইন পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে শর্টস পরে খেলার জন্য মারধরের পর এবার কিশোরী ফুটবলারদের অ্যাসিড ছোড়ার হুমকি সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গত ২৯ জুলাই বিকেলে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার তেঁতুলতলা গ্রামে বিভাগীয় অনূর্ধ্ব-১৭ দলের চার নারী ফুটবলারকে মারধর করেন স্থানীয় ব্যক্তিরা। বাংলাদেশের মেয়েরা যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলায় সুনাম অর্জন করছে, তখন দেশের অভ্যন্তরে নারী ফুটবলারদের শুধুমাত্র ফুটবল খেলার জন্য হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। শুধু হামলা করেই তাঁরা থেমে থাকেননি। আসামিরা জামিন পেয়ে নারী ফুটবলারদের মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে অ্যাসিড নিক্ষেপ করার হুমকির কারণে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের সজাগ থাকতে হবে বলে কমিশন মনে করে। হামলার শিকার নারী ফুটবলারদের নির্বিঘ্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুলিশ সুপার, খুলনা-কে বলা হয়েছে।

ঋণের চাপে পিষ্ট চা দোকানির আত্মহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের তাগিদ

অভিযোগ নং-সুয়োমটো খু. ১৩/২৩

গত ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত "ঝিনাইদহে ঋণের চাপে আত্মহত্যা" সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানীতে ঋণের চাপে এক চা দোকানি আত্মহত্যা করেছেন। দাদন ব্যবসায়ীদের উচ্চ সুদহারের ঋণ শোধ করতে না পেরে চাপের কারণে এ রকম আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। উচ্চ হারে সুদসহ ঋণের ফাঁদ তৈরি করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার মাধ্যমে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ধরনের অমানবিক ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে।

এ অবস্থায়, উল্লিখিত ঘটনায় আত্মহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ তদন্তপূর্বক চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহকে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বরাবর প্রেরণ করা হয়।

পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে "গাজীপুরে পুলিশ হেফাজতে ব্যবসায়ীর মৃত্যু, বিক্ষোভ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গাজীপুরে এক ব্যবসায়ীকে থানায় চারদিন আটকে রেখে নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ পাওয়া যায়। পুলিশের হেফাজতে একজন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এছাড়া তাকে গ্রেফতারের পর আইন অনুসারে যথা সময়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়নি। একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির না করার বিষয়টি সংবিধানের ৩৩(২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৬১ ধারার ব্যত্যয়। বর্ণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের যথাযথ শাস্তি প্রদান না করায় কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করছে। এ অবস্থায়, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গাজীপুরের বাসন থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জসহ জড়িত পুলিশ সদস্যদের অপরাধ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে।

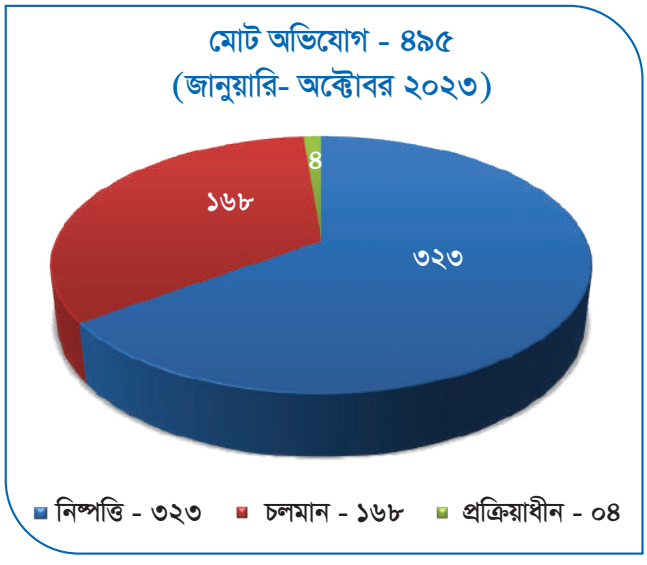

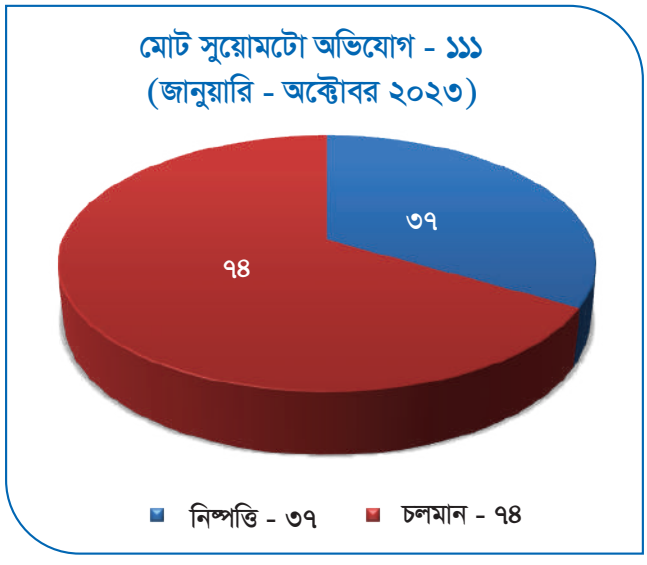

কারাগার ও হাসপাতাল পরিদর্শন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

১৮ জানুযারি ২০২৩ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

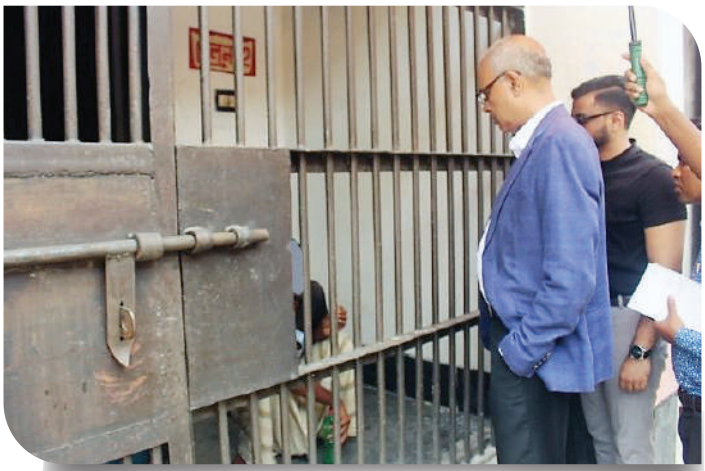

২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা

১ মার্চ ২০২৩ তারিখ নাটোর জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পাবনা মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা

১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক

১০ জুলাই ২০২৩ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে বৈঠক করেন। তাঁরা নির্বাচন নিয়ে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২৫ জুলাই ২০২৩ তারিখ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সাথে বৈঠক করেন। তিনি নির্বাচন নিয়ে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

০২ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিজ গুয়েন লুইজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শুরুতেই তিনি নবগঠিত কমিশনকে অভিনন্দন জানান। কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

কমনওয়েলথের প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের করেন। বৈঠকে কমনওয়েলথ প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের উপদেষ্টা এবং প্রধান লিনফোর্ড এনড্রুস, রাজনৈতিক উপদেষ্টা লিন্দে মালেলেকা, নির্বাহী কর্মকর্তা জিপ্পি অজাগো, সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (এশিয়া) সার্থক রায়- উপস্থিত ছিলেন। এসময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস্ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখ কমিশন কার্যালয়ে জাতিসংঘের কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার মিজ এলিস ক্রুজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন

২১ মার্চ ২০২৩ তারিখ কমিশন কার্যালয়ে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা ভন লিন্ডে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসডুপুই, জার্মানির রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রয়েস্টার ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত এ্যান জেরারড ভ্যান লিউয়েন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

১৭ই মে ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সাথে চরম দারিদ্র্য এবং মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অলিভিয়ের দো স্কুটার সাক্ষাৎ করেন

আন্তর্জাতিক ফোরামে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সক্রিয় অংশগ্রহণ

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৮তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং উপপরিচালক মোঃ আজহার হোসেন। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ভারতের নিউ দিল্লীতে অবস্থিত বিজ্ঞান ভবনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে গত ০৬ই নভেম্বর ২০২৩ তারিখ গ্লোবাল এলায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউশনস এর ১৪তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং পরিচালক কাজী আরফান আশিক যোগদান করেন।

১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে কমিশনের পক্ষে উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন।

Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় গত ১৫ই মার্চ যোগদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, GANHRI চেয়ারপার্সনের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন তাঁরা

তুরস্কে অনুষ্ঠিত চীফ অম্বুডসম্যান সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা

কাতারে ২১-২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে কমিশনের সদস্য ড. বিশ্বজিৎ চন্দ অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে মানবপাচারের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনকে উল্লেখ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

মালদ্বীপে ১৯-২০ জুন অনুষ্ঠিত চাইল্ড রাইটস ইন্সটিটিউশনস অফ সাউথ এশিয়া শীর্ষক রিজিওনাল সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সদস্য জনাব কাওসার আহমেদ অংশগ্রহণ করেন এবং শিশু অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

নেপালে গত ২০-২২ মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইউএন ফোরাম অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস শীর্ষক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সদস্য কংজরী চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে গত ৬-৯ জুন ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৩য় ব্যবসা ও মানবাধিকার ফোরামে কমিশনের পক্ষে উপপরিচালক মোঃ তৌহিদ খান ও উপপরিচালক ফারহানা সাঈদ অংশগ্রহণ করেন।

বর্তমান কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দের তালিকা

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৩
chairman@nhrc.org.bd

মোঃ সেলিম রেজা
সার্বক্ষণিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৫
ftm@nhrc.org.bd

মোঃ আমিনুল ইসলাম
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
judgeaminul12@gmail.com

কংজরী চৌধুরী
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
kongchy7777@gmail.com

ড. বিশ্বজিৎ চন্দ
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
bchandalaw@gmail.com

ড. তানিয়া হক
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
tania14bd@gmail.com

কাওসার আহমেদ
অবৈতনিক সদস্য
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ahmed.kawser00@gmail.com

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা

মোঃ আশরাফুল আলম
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৮
liptonbjs@gmail.com

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২২
director.admin@nhrc.org.bd
ashik.nhrc@gmail.com

মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৪
gaji.complaint@nhrc.org.bd
gaji_salauddin@yahoo.com

এম. রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২০
rabiul.complaint@nhrc.org.bd
robinnhrc@gmail.com

সুস্মিতা পাইক
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২১
paiksusmita@gmail.com

মোঃ আজহার হোসেন
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
azahar@nhrc.org.bd

মোহাম্মদ তৌহিদ খান
উপপরিচালক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
touhid@nhrc.org.bd

ফারজানা নাজনীন তুলতুল
উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৪১৬৫
farjanatultul@gmail.com

মোঃ জামাল উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭১৯
dd.admin@nhrc.org.bd

ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক ও
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৩
farhana@nhrc.org.bd

জেসমিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক
(অভিযোগ, পর্যবেক্ষণ ও সমঝোতা)
এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়
টেলিফোন: ০২৪৭৭৭২৩৩৮৮৫
ad.mediation@nhrc.org.bd
jesmintani3511b@gmail.com

মোঃ রবিউল ইসলাম
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার
জেলা কার্যালয়
টেলিফোন: ০২৩৩৩৩৪৬৭১৩
০২৩৩৩৩৭১৮৩০
rabiduens@gmail.com

মোঃ রাকিব হোসেন
সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
mrhossain012@gmail.com

ইফতেখার উদ্দীন
সহকারী পরিচালক (আইন)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
uddiniftekhar63@gmail.com

ইউশা রহমান
জনসংযোগ কর্মকর্তা
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
eusha.rahman22@gmail.com

মোঃ তানবিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
(সমাজসেবা এবং কাউন্সেলিং)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
tanbirnhrc2023@gmail.com

মোঃ শাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
shahed.du.fin22@gmail.com

মোঃ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ruhulamin.nhrc@gmail.com

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
limonanwar1@gmail.com

মোঃ মোজাফফর হোসেন
সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
mhossainnhrc23@gmail.com

প্রমা প্রনতি
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
promapronitydu@gmail.com

তাকী বিল্যাহ্
সহকারী পরিচালক (গবেষণা)
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
taqeebillah@gmail.com

মোঃ জুম্মান হোসেন
সহকারী পরিচালক (অর্থ) চলতি দায়িত্ব
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
jummannhrc@gmail.com

মোঃ রহমতুল্লাহ
গ্রন্থাগারিক
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
rahmatullah.sh94@gmail.com

মোঃ জুলফিকার শাহিন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
titulig00@gmail.com

মোঃ আবু সালেহ্
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
টেলিফোন: ৫৫০১৩৭২৬-২৮
nikhil.bd2009@gmail.com

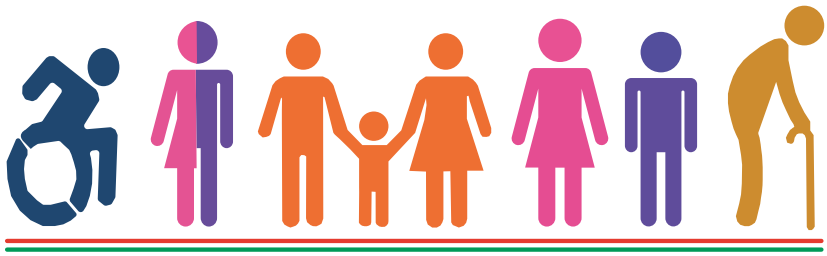

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫

পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮

e-mail : info@nhrc.org.bd

Website : www.nhrc.org.bd

হেল্পলাইন: ১৬১০৮